বাংলার বাণী

শ্রীসারদাচরণ দত্ত
অবসরপ্রাপ্ত হেড্ মাষ্টার,
বাবুরহাট হাই স্কুল।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

বাংলার ছাত্রছাত্রীদের
কর-কমলে

গ্রন্থকারের নিবেদন

নব্যভারতের জন্মদাতা রূপে যে বাংলা দেশকে লইয়া আমরা গর্ব করিতাম, সে বাংলা দেশ আজ দ্বিধা বিভক্ত। বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পররাষ্ট্রগত, কিছুটা বিহার এবং আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। গত এক শতাব্দীর সাধনায় বাংলা দেশে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, নানা কারণে আজ তাহা বিপন্ন। কোনো জিনিষ গড়িয়া তোলা অতিশয় কঠিন, কিন্তু ভাঙ্গিয়া ফেলা অত্যন্ত সহজ। বহু মহাপুরুষের সযত্ন অধ্যবসায়ে যে দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে সে দেশকে ভাঙ্গিতে সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় নাই। এক শতাব্দীর কাজ মাত্র কয়েক বৎসরের তাণ্ডবে ধূলিসাৎ হইয়াছে। ইংরেজের চক্রান্তে একবার বাংলা দেশ বিভক্ত হইয়াছিল। সেই চক্রান্তকে রোধ করিবার জন্য বাঙালী সেদিন মরণপণ করিয়াছে। ভাঙ্গা দেশ জোড়া লাগিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পরে বাঙালী ইংরেজের সেই চক্রান্তের কাছেই হার মানিল। ইহা বাঙালী চরিত্রের পরাজয় ছাড়া আর কি ?

এখন আর এক নূতন বিপদ দেখা গিয়াছে। বাঙালী বাংলা দেশ ইত্যাদি কথা উচ্চারণ করিতে গেলেই প্রাদেশিকতার অপরাধে অপরাধী হইবার আশঙ্কা আছে। বাঙালীকে যাহারা ভাল করিয়া জানেন এবং বোঝেন, তাহারা স্বীকার করিবে যে, বাঙালী সাধারণত প্রাদেশিক ভাবাপন্ন নয়। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্বভারতীয় রাষ্ট্র এবং সভার কল্পনা বাঙালীর মস্তিষ্কেই প্রথম দেখা দিয়াছিল।

কেবল মাত্র বংশ গৌরব লইয়া আস্ফালন অযোগ্য সন্তানের লক্ষণ। কিন্তু বংশ গৌরবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সুযোগ্য সন্তানের উপযুক্ত কাজ নয়। কাজেই বাঙালী যদি জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হয়, তবে তাঁহা জাতির

পক্ষে মঙ্গলের হইবে না। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি একথা নিরুদ্বেগ ঔদাসীন্যের সঙ্গে এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। এখন ইহার যথার্থ্য প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার ফল আরও বিষময় হইবে। আত্মবিস্মৃতি আত্মহত্যার পর্যায় ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

বাঙালী জাতির গৌরবময় ইতিহাস যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন, কি ভাবে জ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, কোন্ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহারাই ইঙ্গিত দিবার জন্য কিছু কিছু রচনা সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিলাম। বলিয়াছি, ইহা ইঙ্গিতমাত্র। ইহার সূত্র ধরিয়া ছেলেমেয়েরা এ বিষয়ে বিশদ ভাবে পাঠ এবং আলোচনা করিবে। তবেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

কলিকাতা;
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫

শ্রীসারদাচরণ দত্ত।

সূচীপত্র

"ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে —অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে শিক্ষার অভাবকে।"

রবীন্দ্রনাথ

"বাংলা যদি মরে ত, কে বাঁচিয়া থাকিবে? বাংলা যদি বাঁচে ত, কে-ই বা মরিবে?"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

মানুষ কত দিনের ?

বিজয়চন্দ্র মজুমদার
পোষ্ট গ্রাজুয়েট শ্রেণীর অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের জন্মভূমির—এই পৃথিবীর বয়স ন্যূনকল্পে ছয় কোটি বৎসর বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। মানব এই বৃদ্ধা বসুন্ধরার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান; সর্ববিধ জীব জন্তুর জন্মের পর মানুষের জন্ম। মানব শিশু যে দিন সর্ব প্রথম ধরিত্রী-জননীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিল, সে দিনের গণনা লইয়া এখনও সূক্ষ্ম বিচার চলিতেছে; সম্ভবত ইহা পনর লক্ষ বৎসর পূর্বের কথা। পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ যে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিল, সে সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে, যথাসাধ্য বয়স কমাইয়া বিচার করিলেও আমাদের প্রত্যেকের শরীর পাঁচ ছয় লক্ষ বৎসরের ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া স্বীকৃত হইবে। প্রত্যেক মানবের শরীর যখন পাঁচ ছয় লক্ষ বৎসরের আবর্তনে বর্তমান যুগের পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তখন চেহারা দেখিয়া মানুষকে যত অল্প বয়স্ক মনে হয়, সে তত অল্প বয়স্ক নহে। মাতা বসুন্ধরার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তানটি নিতান্ত খোকা নহেন।

পাঁচ ছয় লক্ষ বৎসর পূর্বে জন্ম হইলেও, বর্বরতা পরিহার করিয়া 'সভ্য' হইয়া উঠিতে মানুষের পক্ষে অনেক দিন লাগিয়াছিল। যেখানে মানুষ একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়িতে পারিয়াছিল, আপনাদের [illegible] ও উন্নতির জন্য অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, কল কৌশল উদ্ভাবন করিয়া কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতিতে ধন-সম্পদ বাড়াইতে পারিয়াছিল, কেবল কথাবার্তায় ভাবের আদান-প্রদান শেষ না করিয়া মনের ভাবের উপাদানে স্থায়ী সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়াছিল, বংশক্রমে

আপনাদের কীর্তি ও গৌরবের কথা স্মৃত হইবার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, সেইখানেই মানুষ সভ্য হইয়াছিল বলিয়া থাকি। কুত্রাপি এই প্রকার সভ্যতা লাভের ইতিহাস দশ হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী বলিয়া ধরা যায় না। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব ভাগে নাইল নদীর উপত্যকা প্রদেশে অর্থাৎ মিশর দেশে এবং এসিয়ার পশ্চিম খণ্ডে টাইগ্রীশ ও ইউফ্রেটীশ নদী ধৌত প্রদেশে মানবের প্রাচীনতম সভ্যতার নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতের আর্যসভ্যতা অতি প্রাচীন হইলেও, মিশরের সভ্যতার মত প্রাচীন কি না তাহা প্রমাণিত হয় নাই। চীন দেশের সভ্যতাও সুপ্রাচীন, কিন্তু তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। গ্রীশ দেশের সভ্যতা এবং ইতালীদেশের রোমক সভ্যতা প্রাচীন হইলেও অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।

মিশর হইতেই ভাস্কর শিল্প, চিত্রকলা, লিপিকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি গ্রীশদেশে সংক্রামিত হইয়াছিল এবং গ্রীশ সভ্যতাই রোমসাম্রাজ্যে বিকাশ লাভ করিয়া সমগ্র ইয়োরোপে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

'প্রাচীন সভ্যতা'

বাংলার ভূগোল।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি, এইচ্ ডি,
ঢাকা ইউনিভার্সিটীর ভূতপূর্ব ভাইস্ চেন্সেলর।

প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গে (বর্তমান রাজসাহী বিভাগ) পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র (অথবা

বরেন্দ্রী) পশ্চিম বঙ্গে (বর্দ্ধমান বিভাগ) রাঢ় তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে (প্রেসিডেন্সী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ গৌর নামে সুপরিচিত ছিল। এই সমুদয় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইত।

"বঙ্গাল" দেশের নাম হইতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের নাম বাংলা এই নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন, তবে এক কালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি যে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদিগকে যে, বাঙ্গাল নামে অভিহিত করে তাহা সেই প্রাচীন 'বঙ্গাল' দেশের বহন করিয়া আসিতেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' নামে এই দুইটি সমগ্র বাংলা দেশের সাধারণ নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু যুগে ইহারা বাংলা দেশের অংশ বিশেষকেই বুঝাইত, সমগ্র দেশের নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই।

উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি লইয়া বাংলা দেশ গঠিত। পূর্বে গারো ও লুসাই পর্বত ও পশ্চিমে রাজমহলের নিকটবর্তী পর্বত ও অনুচ্চ মালভূমি পর্যন্ত এই সমতলভূমি বিস্তৃত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুসংখ্যক নদনদী এই বিশাল সমতলভূমিকে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা করিয়াছে। পশ্চিমে গঙ্গা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা, উপশাখা ও উপনদীই বাংলা দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদন ও ইহার বিভিন্ন অংশের সীমা নির্দেশ করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু যুগে এই সমুদয় নদনদীর গতি ও অবস্থিতি যে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। কারণ গত তিন চারি শত বৎসর মধ্যেই যে এ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে বাংলার বর্তমান কয়েকটি বড় বড় নদীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুচ্চ রাজমহল পর্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গানদী বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। পর্বত ও নদীর মধ্যবর্তী এই সঙ্কীর্ণ প্রদেশ পশ্চিম হইতে আগত শত্রুসৈন্য—প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এই জন্যই তেলিয়াগঢ়ি ও শিকরাগলি গিরিশঙ্কট পশ্চিম বাংলার আত্মরক্ষার প্রথম প্রাকার রূপে চিরদিন গণ্য হইয়াছে। ইহার অনতিদূরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড় (লক্ষণাবতী), পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, ও রাজমহল প্রভৃতি নগরের পত্তন হইয়াছে

বর্তমান কালে প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ জলরাশিই বিশাল পদ্মা নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহন করে। আর যে ভাগীরথী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কলিকাতার নিকট দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে—তাহার উপরিভাগ শুষ্কপ্রায়। কিন্তু প্রাচীন কালে গঙ্গানদীর প্রধান প্রবাহ সোজা দক্ষিণে যাইয়া ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করিত। ভাগীরথী অপেক্ষা সরস্বতী নদীই প্রথমে বড় ছিল। ইহা সপ্তগ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া তমলুকের (প্রাচীন তাম্রলিপ্ত) নিকট সমুদ্রে মিশিত এবং রূপনারায়ণ, দামোদর ও সাঁওতাল পরগণার অনেক ছোট ছোট নদী ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার স্রোত বৃদ্ধি করিত। এই সরস্বতী নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলেই প্রথমে তাম্রলিপ্তি ও পরে সপ্তগ্রাম এই দুই প্রসিদ্ধ বন্দরের অবনতি হয়। তখন ভাগীরথী, সরস্বতীর স্থান অধিকার করে এবং ইহার ফলে প্রথমে হুগলী পরে কলিকাতার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ভাগীরথীরও অনেক

পরিবর্তন হইয়াছে। কলিকাতার পরে পশ্চিমে শিবপুর অভিমুখে না গিয়া শতবৎসর পূর্বেও ইহা সোজা দক্ষিণ দিকে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে পদ্মা নদীর অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য নহে। সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও যে পদ্মা নদী ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমান আছে। প্রথমে পদ্মা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই ইহা বিশাল আকার ধারণ করে। পদ্মা নদীর প্রবাহ-পথের বহু পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও প্রাচীন কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবত পূর্বে পদ্মা চলনবিলের মধ্য দিয়া বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার ধার দিয়া প্রবাহিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিম্নভাগ বর্তমান কাল অপেক্ষা অনেক দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জিলার মধ্য দিয়া চাঁদপুরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণসাবাজপুরের উপর মেঘনার সহিত মিলিত হইত। মহারাজ রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর তখন পদ্মার বামতীরে অবস্থিত ছিল। এই নগরীর নিকট দিয়া কালীগঙ্গা নদী পদ্মা হইতে মেঘনা নদী পর্যন্ত প্রবাহিত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার জলস্রোত এই কালীগঙ্গার খাত দিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং ইহার নাম হয় কীর্তিনাশা। তার পর পদ্মার আরও পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ পুরাকালে গাড়ো পাহাড়ের পাশ দিয়া দক্ষিণপূর্ব মুখে ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঢাকা জিলার পূর্বভাগে সোনারগাঁর নিকট ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিলিত হইত। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী নাঙ্গলবন্দে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের শুষ্কপ্রায় খাতে এখনও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু অষ্টমী স্নানের জন্য সমবেত হয়। বর্তমানে

ব্রহ্মপুত্রের জল প্রবাহ সোজা দক্ষিণে গিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অংশের নাম যমুনা।

তিস্তা (ত্রিস্রোতা) উত্তর বঙ্গের প্রধান নদী। প্রাচীনকালে ইহা জলপাইগুড়ির নিকট দিয়া দক্ষিণ দিকে তিনটি বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইত। সম্ভবত এই কারণেই ইহা ত্রিস্রোতা নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে 'করতোয়া' পশ্চিমে 'পুনর্ভবা' এবং মধ্যে 'আত্রেই' নদীই এই তিনটি স্রোত। আত্রেই নদী চলনবিলের মধ্য দিয়া করতোয়ার সহিত মিলিত হইত। করতোয়া এখন শুষ্কপ্রায়, কিন্তু এক কালে খুব বড় নদী ছিল এবং ইহার তীরে প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী অবস্থিত ছিল। করতোয়ার জল পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং করতোয়া মাহাত্ম্য এই পুণ্যসলিলা নদীর প্রাচীন প্রসিদ্ধির কারণ। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে ত্রিস্রোতার মূল নদী পূর্ব খাত পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হয়। প্রাচীন কৌশিকী (বর্তমান কুশী) নদী এক কালে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে সমস্ত উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইত। ক্রমে পশ্চিমে সরিতে সরিতে ইহা এখন বাংলার বাহিরে পুর্ণিয়ার মধ্য দিয়া রাজমহলের উপরে গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই সমুদয় সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে গত পাঁচ ছয়শত বৎসরের মধ্যে বাংলার নদনদীর স্রোত কত পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে প্রাচীন হিন্দু যুগেও যে অনুরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দু যুগের বাংলা দেশের ইতিহাস পাঠকালে একথা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র বর্তমান কালের নদনদীর অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কোন রূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

নদনদীর গতি ও প্রবাহ ব্যতীত অন্য প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনেরও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চল যে এক কালে সুসমৃদ্ধ জনপদ-পূর্ণ লোকালয় ছিল এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ আছে। ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়ার বিল অঞ্চলে যে খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নগরী, দুর্গ ও বন্দর ছিল শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র উচ্চতর প্রদেশ হইতে মাটি বহন করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গের বদ্বীপে যে নূতন ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলেও অনেক গুরুতর প্রাকৃতিক পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং নদনদীর ন্যায় বাংলার স্থলভাগও হিন্দু যুগে এখনকার অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল।

'বাংলার ইতিহাস'

বাঙ্গালী জাতি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, এইচ, ডি।

প্রকৃত ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি প্রাচীন বাংলার সেরূপ ইতিহাস লেখার সময় এখনও আসে নাই। কখনও আসিবে কি না তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশে এই যুগে লিখিত কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। সুতরাং প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অতীতের অন্যান্য স্মৃতি চিহ্নই এই ইতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ। এ পর্যন্ত যে সমুদয় উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে যতদূর সম্ভব পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিতেছি। কিন্তু উহা বাংলার ইতিহাস নহে, তাহার কঙ্কাল মাত্র।

আজ বাংলার ইতিহাসের-উপকরণ পরিমাণে মুষ্টিমেয়। কিন্তু

মুষ্টি হইলেও ধূলিমুষ্টি নহে—স্বর্ণমুষ্টি। ইহার সাহায্যে আমরা বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের প্রকৃতি, গতি ও ক্রমবিবর্তন জানিতে পারি না; এমন কি তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও করিতে পারি না, একথা সত্য। কিন্তু তথাপি এই সমুদয় সম্বন্ধে যে ক্ষীণ আভাস বা ইঙ্গিত পাই তাহার মূল্য খুবই বেশী। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কতদূর গভীর ছিল এবং গত একশত বৎসরে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "রাজাবলী" এই ইতিহাসের তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতগুলি নিছক গল্প ও অলীক কাহিনীই ইতিহাস নামে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালীর অতীত কীর্তি বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

আজ ইতিহাসের একটু টুকরা মাত্র আমরা জানি। কিন্তু ইহা হীরার টুকরার মতই ভাস্বর দীপ্তিতে অতীতের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়াছে। বিজয় সিংহের কাল্পনিক সিংহল বিজয় কাহিনীই বাঙ্গালীর সাহস ও বীরত্বের একমাত্র নিদর্শন বলিয়া এতদিন গণ্য ছিল। আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বাঙ্গালীর বাহুবল সত্যই একদিন তাহার গর্বের বিষয় ছিল। বাঙ্গালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়া যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী ধর্মপাল ও দেবপাল তাহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া সুদূর পঞ্চনদ অবধি বাহুবলে বাঙ্গালীর রাজশক্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্ষীণ দেহ বাঙ্গালী ধর্মপাল কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বসিতেন, আর সমগ্র আর্যাবর্তের রাজন্যবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। গঙ্গাতীরে মৌর্যসম্রাট অশোকের কীর্তিপূত পাটলিপুত্র নগরীর রাজসভায় পাল সম্রাটগণের আদেশানুবর্তী হইয়া ভারতের দূর দূরান্তর প্রদেশ হইতে আগত সামন্ত রাজন্যবর্গ বহুমূল্য উপঢৌকন সহ

নগ্ন শিরে দণ্ডায়মান হইয়া পাল সম্রাটের প্রতীক্ষা করিতেন। ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য ঘটনা। আজ বাঙ্গালী ভীরু দুর্বল বলিয়া খ্যাত, ভারতের সামরিক শক্তিশালী জাতির পংক্তি হইতে বহিস্কৃত—কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেও বাঙ্গালী বলীয়ান ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ হইতে বিতারিত বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালীর রাজ্যেই শেষ আশ্রয় লাভ করিয়া চারিশত বৎসর টিকিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল বাঙ্গালী বৌদ্ধ জগতের গুরুস্থানীয় ছিল। উত্তরে দুর্গম হিমগিরি পার হইয়া তিব্বতে তাহারা ধর্মের নূতন আলো বিকীর্ণ করিয়াছিল। দক্ষিণে দুর্লঙ্ঘ্য জলধির পরপারে সুদূর সুবর্ণদ্বীপ পর্যন্ত বাঙ্গালী রাজার দীক্ষাগুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশীল বিহার বাংলার বাহিরে অবস্থিত হইলেও চারিশত বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালীর রাজশক্তি, মনীষা ও ধর্ম ভাবের দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

বাণিজ্য সম্পদে একদিন বাঙ্গালী ঐশ্বর্যশালী ছিল। তাম্রলিপ্তি হইতে তাহার বাণিজ্যপোত সমুদ্র পার হইয়া দূর দূরান্তরে যাইত। বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র-শিল্প সমুদয় জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যেও বাঙ্গালীর দান অকিঞ্চিৎকর নহে। জয়দেব কোমলকান্ত পদাবলী সংস্কৃত সাহিত্যের বুকে কৌস্তভ মণির ন্যায় চিরকাল বিরাজ করিবে। যতদিন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা থাকিবে ততদিন গৌড়ী রীতি এবং বল্লাল সেন, হলায়ুধ, ভবদেব ভট্ট, সর্বানন্দ, চন্দ্রগোমিন, গৌড়পাদ, শ্রীধর ভট্ট, চক্রপানি দত্ত, জীমূতবাহন, অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচার্য ও উমাপতি ধর প্রভৃতির রচনা সমগ্র ভারতে আদৃত হইবে। বাংলার সিদ্ধাচার্যগণের মূল গ্রন্থাবলী যদি কখনও আবিষ্কৃত হয় তবে বাঙ্গালীর প্রতিভার নূতন একদিক উদ্ভাসিত হইবে।

শিল্প জগতে মধ্যযুগে বাঙ্গালীর স্থান অতিশয় উচ্চে। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা যখন ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল, যখন লাবণ্য ও সুষমার পরিবর্তে প্রাণহীন ধর্মভাবের ব্যঞ্জনাই শিল্পের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল তখন বাঙ্গালী শিল্পীই মূর্তিগঠনে ও চিত্রকলায় প্রাচীন চারুশিল্পের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোমপুরে (উত্তর বঙ্গে) বাঙ্গালী যে বিহার ও মন্দির নির্মান করিয়াছিল সমগ্র ভারতে তাহার তুলনা মিলে না। বাংলার স্থপতিশিল্প ও ভাস্কর্য সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এইরূপে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, প্রাচীন যুগে বাঙ্গালীর কীর্তি ও মহিমা আমাদের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিবরণ হইতে সেকালের যে পরিচয় পাওয়া যায় বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহাতে গৌরব বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। হয়ত ইহার ফলে বাঙ্গালীর মনে অতীত ইতিহাস জানিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং সমবেত চেষ্টার ফলে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্ভব হইবে।

আজ যে ছয় কোটি বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে আছে ভাষার ঐক্য এবং দীর্ঘকাল একই দেশে এক শাসনাধীনে বসবাস। ধর্ম, সমাজগত গুরুতর প্রভেদ সত্বেও এই দুই কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক হইয়া বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

'বাংলার ইতিহাস'

বাংলার ব্যক্তিত্ব।

পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ;

একদিন তিনি ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে—তিন ভাষায়—কাগজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব তাহার আবিস্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে এক চেটিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলার কাণাভট্ট শিরোমনি রঘুনাথ মেধার এতই উন্নতি সাধন করিলেন যে, তিনি ক্রমে শ্রুতিধর হইয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া রঘুনাথ তাবত ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন। ফলে মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্র স্বরূপ হইল।

বাঙ্গালী সকল বিষয়ে চূড়ান্ত করিয়াছে। গোটা কয়েক উদাহরণ দিব :—

(১) দায় ভাগ ও স্ত্রীধন বিন্যাসে বাঙ্গালী স্মার্ত যে গণবাদের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডেও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কল্পনা মাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত সকল পুরামাত্রায় এখনও বৃটিশ জাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ; Feudalism এর বিরুদ্ধে বিষম Protest. সহস্র বৎসর পূর্বেও, সব সভ্য জাতির আগে ভাগে এই প্রতিবাদটি করিয়া গিয়াছেন।

(২) স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন একজন বিষম Protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব, বঙ্গবাসীর গোঁড়ামির

[illegible] জাতি সকলের মধ্যে যে ব্যাপক [illegible] দিয়াছেন তাঁহা অপূর্ব এবং অতুল্য। [illegible] বাংলার আচার্য্যদিগের "ছুৎমার্গ" দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই। রঘুনন্দনকে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইদানিং বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, অজ্ঞান বশতঃ তাঁহার প্রতি অনেকে কঠোর হইয়া আছেন। রঘুনন্দন বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের প্রধান সাধক পুরুষ।

(৩) *শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার* আর একটা উপাদান। রামানুজাচার্য, ভল্লবাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক প্রভৃতির ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের আচার্য সম্প্রদায় যে নানাবিধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন, গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিসঙ্কীর্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি,—এই সকল হিন্দুস্থানী ভজনে ও কীর্তনে শ্বপচাদি (চণ্ডাল প্রভৃতি) অস্পৃশ্য জাতিসকল গণ্ডীর বাইরে স্থান পাইয়া থাকে। বাংলার হরিসঙ্কীর্তনে সে বাধা নাই। উচ্চ নীচ সকল জাতি সমান ভাবে কীর্তন আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, কীর্তনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙ্গালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকুই নহে, সেই কীর্তন-ক্ষেত্রে সকল জাতির কীর্তনীয়ার পদরজের উপরে সোপবীত ব্রাহ্মণও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেই কীর্তনমণ্ডলীর উপরে হরিলুটের বাতাসা ছাড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এতটা বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ, কোন প্রদেশের বৈষ্ণব, করিতে পারে নাই।

(৪) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই ইহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য বলিত। দীপঙ্কর ভুটানে,

তিব্বতে, চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ছিল দিন যখন বাঙ্গালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বত, চীন, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন যখন বাংলায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙ্গালী রমণীকে শৈব বিবাহের সাহায্যে, শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। "ভরার মেয়ে বিবাহ" বাংলা দেশে বংশজ ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে এবং কুলাচারী অন্য জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নববধূর জাতি কুলের পরিচয় লইয়া ঘোঁট হইত না। ইহা একটা বড় কথা।

(৫) বাংলার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল কবিই ব্রাহ্মণ; পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero এবং Heroine—নায়ক নায়িকা—ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবনিক, সদোপ, কৈবর্ত, গোড়ো গেয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ সকলই এই সকল কাব্যের নায়ক। আরও মজা দেখ, ভারতচন্দ্রের পূর্বকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘটস্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, সে জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতি, প্রমুখ নায়কগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন? ইহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে?

(৬) এই সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাংলা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সেই পরিচয় পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাংলা ভাষার খোঁজ করিতে হয়। সিদ্ধাচার্য গীত ও দোঁহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি

পর্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মন্থন প্রয়োজন। এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যও অপূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবিরগান, পাঁচালীর গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্ত্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীত সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল ইতিহাস কেহ সংগ্রহ করে নাই।

(৭) বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ শরীরে সর্বাবয়বে শিল্পকলায়, গানে নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মানে, নৌকা প্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বয়ন শিল্পে, তসর গরদের বসন প্রস্তুতিতে, গজদণ্ডের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে, সভ্য জাতির সকল বসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্র সপ্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, বাংলার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের technique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ভাস্কর্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র।

বাংলার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যেও খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে। বাংলার কবিওয়ালোদের ঢোল বাজানো অপূর্ব এবং অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন জাতি পারে না। বাঙ্গালীর গৃহনির্মাণ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর, আর কোনও জাতিতে পারে না; বাংলার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ সকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত, তেমনটি আর কোথাও ছিল না—নাইও।

বাংলার 'পঙ্খের কাজ' বাঙ্গালীর নিজস্ব। উহা বাংলার বাহিরে ছিল না—নাইও। এখন সে পঙ্খ শিল্পের নমুনা গবর্ণমেণ্ট হাউসের গোটাকয়েক স্তম্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এমন কি, বাংলার জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয়, প্রভৃতি কর্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈরী করিতে পারিত, দিল্লীর কারিগর তেমনটি পারিত না; 'জাহান কোষ' 'দলমাদল', 'কালে খাঁ'—প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বাঙ্গালীর নৌ শিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে, ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বাংলার "ষাট বৈঠার ছিপে" চড়িয়া মীরকাশিম একরাত্রে গোদাগিরি হইতে মুঙ্গের গিয়াছিলেন।

বাংলার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙ্গালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেব-পুত্র মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"কি আর মণি-মুক্তা, চুনি-পান্নার লোভ দেখাও পিতঃ, বাংলার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার সকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

(৮) আসল কথা কি জান? বাঙ্গালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাংলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য সমাজ বিদ্যমান ছিল। বাংলায় বৈদিক ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার কিছুই শিকর গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমদানি করিয়াও বাংলায় যাগ যজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। বাঙ্গালী স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

"বঙ্গবাণী"

(অধুনালুপ্ত বাংলার মাসিক)

কোনও বন্ধুর নিকট স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী।

রাজা রামমোহন রায়

প্রিয় বন্ধু,

আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য আপনি আমাকে সর্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি আহ্লাদের সহিত আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিতেছি।

আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চ শ্রেণীর* ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম-সম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছে। রাজ সভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও সেইরূপ অবস্থার বৈপরিত্য হইয়া আসিয়াছে, কখন সম্মানিত উন্নতিলাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন; কখন সফলতালাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মযাজক-ব্যবসায়ী; এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্তমান সময় পর্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম চিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন

---

* 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশ। নবাব সরকারে কাজ করিয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন তাঁহার প্রপিতামহ।

ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।

আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারে কার্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষায় জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্তভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই।

ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূক্ত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন;—আমি পুনর্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞান লাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তা সম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন, বিদেশী হইলেও, উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও

অন্যান্য কুসংস্কার বিষয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদের আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে আমার প্রতি লোক এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই তিন জন স্কটল্যাণ্ড বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মত বিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গ ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর

জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্যন্ত না মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহুবৎসর পর স্থিরীকৃত হইবে ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুনিবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে, ইংলণ্ডের রাজকর্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই।

আমি আশা করি, এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি ক্ষমা করিবেন ; কেননা এখন বিশেষ বিবরণ লিখিবার আমার অবকাশ নাই।

রাজা রামমোহনের জীবনী

রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক দর্শন একশত পঁচিশ বৎসর পূর্বে।

মুসলমানদিগের সময় যুদ্ধ অধিক হইত, এবং জীবন নিরাপদ ছিল না বলিয়া, এখনকার ন্যায় জন সংখ্যার এত বৃদ্ধি হইত না। এখন সর্বত্র শান্তি সুরক্ষিত হইতেছে বলিয়া, জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, শ্রমজীবীদিগের মজুরি ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। সুতরাং দরিদ্রতাও ক্রমশঃ বাড়িবে। এই

সকল অকল্যাণ সত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। প্রথম মোকর্দমার সুবিচার, ধর্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা, জীবন ও সম্পত্তি বিষয় নিরাপদ অবস্থা, সর্বত্র শান্তি, বৃটিশ শাসনে ভারতে বিশেষ রূপে এই সকল লক্ষিত হইতেছে। আর একটি বিষয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ভারতের মঙ্গল হইতেছে। তাহা এই যে সমস্ত ভারত এক রাজশাসনের অধীনে আসিতেছে। ইহার দ্বারা ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। সমস্ত ভারত এক রাজশাসনের অধীন পূর্বে প্রায় কখনই ছিল না। হিন্দু রাজত্ব কালে এবং মুসলমান রাজত্ব কালে ইহা কখনও ছিল না।

এদেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইয়া ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের ন্যায় রাজনৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপনিবেশ সকলের যে রূপ রাজনৈতিক অধিকার—তাহাদের সহিত ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডীয় গভর্ণমেণ্টের যেরূপ সম্বন্ধ, আমি আশা করি যে ভারতবর্ষ জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত হইয়া সেই রূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেনেডার সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ রাজনৈতিক সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেই রূপ সম্বন্ধ সময়ে নিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। যদি কোন কালে বর্ত্তমান সময়ের কোন ঘটনার দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও এই ভারতরাজ্য সমগ্র এসিয়া খণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতা বিস্তারের উপায়স্বরূপ হইবে। প্রাচীন কালে রোমানেরা তাঁহাদের বিজিত দেশ সকলে রোমদেশীয় সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজদের তদপেক্ষা অধিক করা উচিত। সর্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

'রাজা রামমোহনের জীবনী'

দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমতঃ ব্রাহ্ম সমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল। শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধর্মও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী অসার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গাস্রোতের উপর এই সমাজ রূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর কত যত্ন করিতে হইয়াছিল; তাঁর ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লীর বাদসাহের বেতন ভোগী পর্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছিল। তখন তাঁর মনে এই আনন্দ ছিল যে, ভবিষ্যদ্বংশ আমার সফল করিবে। তাঁর এই ভাব ছিল যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন; আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমরা কর্ষণ করিয়া উহাকে উর্বরা করিব। অতএব রামমোহন রায় আপনার গৃহকার্যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শত গুণ, এক ব্রাহ্মধর্মকে সংস্থাপনের জন্য করিতে হইয়াছিল। এক দিনের জন্য নয়, এক মাসের জন্য নয়, কিন্তু ষোড়শ হইতে উনষষ্ঠি বৎসর পর্যন্ত ইহাতে সমান ভাবে যত্ন ছিল।

যখন প্রথম তিনি কলিকাতা আসিলেন, তখন লোকেরা তাঁহাকে ধর্মচ্যুত, ধর্মভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত। তাঁহার

মুখদর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই; এই প্রকার বাক্য তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তাঁর কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে লোকের হৃদয় ও মন আকর্ষণ করিলেন? কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে সময়কার কলিকাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মানুষ তাঁহার সহচর ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক।

'রাজা রামমোহনের জীবনী'

"শান্ত যে অজেয় তার বল।" —রবীন্দ্রনাথ

কেশবচন্দ্র সেন

দেখিও, প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন বলিয়া যদি ভাই বন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। ক্রোধ পূর্ণ নয়নে কাহারও পানে তাকাইও না। যে ব্যক্তি শান্ত ভাবে সমুদয় বহন করে, তাহার মস্তকে অমৃত—বর্ষণ হয়। বিরোধিগণের প্রতি সর্বদা দয়া রক্ষা করিতে হইবে; কেন না, তাহারা জানে না, কি করিতেছে। সম্পদ বিপদ সকলই সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। একদিক ঊর্দ্ধে আরোহন করিবে, আর এক দিক নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে।

"জীবন বেদ"

মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই ঋণগ্রস্ত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান জ্যোতিবিদ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান এবং সমাদর না করেন—যেখানে গোবধ করিতে এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দুদিগের পর্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহাদি কার্যে প্রতিবাসী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ না করেন।

আমি অনেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য মতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের সহিত কথা বলিবার সময় যখন শুনিলাম—"উত্ত ইয়েঃ হ্যায়"—আমার বোধ হইল, যেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হ ইল।

যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বাসীয় ন হে। মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব-প্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দিভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্মশিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান, নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অনেকেই

ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাহারা অন্যায়চারী ছিলেন তাহাদিগের অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটি ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু এবং মুসলমান যাহাতে সম্মিলন না হইতে পারে ইংরেজ রাজ কর্মচারীরা তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন। ঐ সকল ইংরেজের এই কৌশলটি যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোমসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। ইংরেজ ভারতবাসীর মধ্যে যদি কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে। মুসলমানের হাত হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন এবং মুসলমানের মধ্যেই সম্মিলন-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অধিক আছে। বৈদেশিক রাজবলও মুসলমানদিগেরই পৃষ্ঠপোষক হইতে পারে। আর ভূতপূর্ব সিপাহি বিদ্রোহের সময় যদিও হিন্দু সৈনিকেরাই বিদ্রোহ ঘটনার সূত্রপাত করে, তথাপি মুসলমানই সাম্রাজ্যাসনে বসিয়াছিলেন।

'সামাজিক প্রবন্ধ'

বাংলার পিতামহ রামমোহন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ;

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি) চব্বিশ পরগনায় বাড়ী ছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গতায়ু হন। এই কাল নব্যভারতের জন্মকাল—কারণ, এই সময় মধ্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন প্রভৃতি সর্ববিধ উন্নতির সূত্রপাত হয়। সুতরাং এই কালই নব্যভারতের জন্মকাল।

আমরা নব্যভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ দুই-ই দেখিতেছি। ভূত কালের প্রতি যেমন আমাদের দৃষ্টি রহিয়াছে, তেমনি ভবিষ্যতের একটি ছবিও আমাদিগের সম্মুখে রহিয়াছে। এ দেশে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম সেই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দিব্য চক্ষে ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাইয়া তিনি সেই ছবিটি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে, এমন দূরদর্শন, এমন দৃষ্টি যে মানুষের হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

আমার মনে হয়, তিনি ভারতের ভবিষ্যৎকে অতি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দার্জিলিং'এর ন্যায় উচ্চ পাহাড়ের উপর বসিয়া নীচের দিকে তাকাইলে কত জেলা, গ্রাম,—কত দৃশ্য, দৃষ্টিরেখার নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি রাজা রামমোহন রায় তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা বলে যেন কোন উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজে কাজ করিয়া সেই দৃশ্য কতকটা সকলকে দেখাইয়া গেলেন, আর কতকটা লিখিয়া প্রচার করিয়া গেলেন।

এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি বৃটিশ পার্লেমেণ্টের নিকট যে লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করেন এ দেশের জনসাধারণ এখনও সে সকল অধিকার লাভ করে নাই—এমন কি তাহারা এখনও চাহিতেছে না। কেবল ধর্ম, সমাজসংস্কার বিষয়ে নহে, রাজা রামমোহন রায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অদ্ভুত দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

'নব্যভারতে ভূত ও ভবিষ্যৎ'

রাজনৈতিক একতা একটা মহাশক্তি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ ;

ভারতবর্ষ পূর্বে কখনও এক রাজা, এক রাজ শাসনের অধীন হয় নাই। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও আকবরের সময়ে ভারতবর্ষের বিস্তৃত অংশ এক শাসনাধীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোয়েটা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত, কুমারিকা হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত, এক শাসনাধীন শুধু ইংরেজ রাজত্বেই হইয়াছে। এই রাজনৈতিক একতা একটা মহাশক্তি, এই শক্তি কাজ করিবেই। এখন মান্দ্রাজের লোক এবং আমরা অনুভব করি যে আমাদের রাজনৈতিক দাবী দাওয়া, আমাদের সুখ দুঃখ এক। ইংরেজীভাষা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত হইবার সুযোগ হইয়াছে ; এক শিক্ষা প্রণালী দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মনের ভাব একই আদর্শে গঠিত হইয়াছে ; সংবাদপত্র, পোষ্টাপিশ, রেলওয়ে একতার উপর দাঁড়াইয়াছে। এই একতার বাহিক প্রমান নেশনেল কংগ্রেস প্রভৃতির আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক সহরে

কংগ্রেস হইবে, ভারতের সর্ব প্রদেশের প্রতিনিধি গিয়া সেখানে একত্রিত হইতেছেন। সমগ্র দেশের লোকের মধ্যে আত্মীয়তা প্রীতি স্থাপিত হইতেছে; জাতিভেদ কি তাহা নিবারণ করিতে পারে? প্রেম কি এ সকল বাধা মানে? আমাদিগের ছাত্রজীবনে ভোজের সময় পণ্ডিত মহাশয়গণ ত ব্রাহ্মণের পংক্তি, কায়স্থের পংক্তি, সুবর্ণবনিকের পংক্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া যাইতেন; কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলেই আমরা লাফালাফি করিয়া উঠিয়া যাহার সঙ্গে যাহার ভাব, তাহার কাছে চলিয়া যাইতাম। কোথায় ব্রাহ্মণ আর কোথায় কায়স্থ। ইহা প্রেমের লক্ষণ; এই প্রেমই জাতিভেদ নষ্ট করিবে। ভবিষ্যৎ ভারতে আর জাতি ভেদ থাকিবে না।

নারী জাতির বর্তমান অবস্থাও ভবিষ্যৎ ভারতে থাকিবে না। নারীকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার তোমার আমার কি অধিকার? আমার শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে আমি দায়ী, কাহারও শক্তিকে বাধা দিবার অধিকার আমার নাই। দিন দিন সকলেই বুঝিতেছেন, নারী জাতির উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

'নব্যভারতে ভূত ও ভবিষ্যৎ'

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—তিন দল সবল হইয়া উঠিতেছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ;

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভাবলে কল্পনার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ভাবী ভারতের প্রকৃত ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, তিন দল প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই তিন দলকে ধর্মের এক উদার সাধারণ ভূমিতে দাঁড়

করাইতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তাই তিনি বলিলেন, "মুক্তিদাতা বিধাতাকে প্রীতি কর, পাপ পরিত্যাগ কর, পুণ্য আশ্রয় কর, মানবের সেবাকে ঈশ্বরের সেবা জ্ঞান কর।" তাঁহার এই উপদেশ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই প্রতি, এই শিক্ষা সকলেরই গ্রহণীয়; সকলের মধ্যে এই বিশ্বজনীন, আধ্যাত্মিক ধর্মভাব জাগ্রত হইলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ভেদের গণ্ডী বিলুপ্ত হইবে, সকলের মধ্যে মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের উত্থানের পথে অনেক আপদ বিপদ, অনেক বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে সত্য, তথাপি ভারত কিছুতেই মরিবে না। বিনা কষ্টে, বিনা শ্রমে কোন জাতি কবে জাগিয়াছে? ব্যক্তিগত জীবনে যেমন উঠিয়া পড়িয়া তবে মহত্ব লাভ করে, জাতীয় জীবনের উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া জাতিসকল উঠিয়া থাকে। ভারতের প্রজাকুল যদি জীবনের মহত্ব ভুলিয়া যায়, ধর্মকে জীবনে লাভ করিতে সচেষ্ট না হয়, তবে কাহার সাধ্য এ জাতিকে উন্নত করে? তাহা হইলে ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার! বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেকে বিষণ্ণ হন, কিন্তু নিরাশ হইবার আবশ্যক নাই। প্রজাকুলকে শিক্ষা দাও। আমাদের দেশে শতকরা দশ জন পুরুষ শিক্ষা পান কিনা সন্দেহ; স্ত্রীলোক বোধ হয় শতকরা চারি জনের অধিক শিক্ষা পান না। লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ অজ্ঞ। প্রাথমিক শিক্ষা যেন অবৈতনিক হয়, তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে নিতান্তই লজ্জার কথা যে; নিজেরা রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি তাঁহারা উদাসীন। তাঁহারা শক্তি (Power) চাহেন, কিন্তু কর্তব্য (Duty) পালন করিতে প্রস্তুত নহেন।

'নব্যভারতে ভূত ও ভবিষ্যৎ'

গৃহ পরিবারের সৃষ্টি মানব চরিত্রকে কর্মক্ষম করিবার জন্য বিধাতার সম্পূর্ণ বিধান।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ।

যথেচ্ছাচারী রাজা হওয়া কোন স্থানে ভাল নয়। যদি কোন স্থান ইহার বিশেষ অনুপযুক্ত থাকে, তাহা পরিবার। যেখানে যথেচ্ছাচার সেখান হইতে প্রেম অন্তর্হিত হয়। পরিবারস্থ প্রত্যেকের সুখ দুঃখের প্রতি যাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি, সকলের বিনা বেতনের সেবক হইতে যিনি প্রস্তুত, তিনিই পরিবারের প্রভু হইবার উপযুক্ত।

মানব চরিত্রের যে সকল সদ্‌গুণে সমাজ বড় হয়, বা জাতীয় জীবন উন্নত হয়, তৎসমুদয়ের শিক্ষা ও বিকাশের স্থান গৃহ পরিবার। ভাবিয়া দেখ, সন্তানদিগের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব জ্ঞানে কর্তব্যনিষ্টার শিক্ষা; বাৎসল্যে নিঃস্বার্থতার শিক্ষা; তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাতে মিতব্যয়িতা ও পরিণামদর্শিতার শিক্ষা, তাহাদের চরিত্রগঠনের চিন্তাতে সংযমের শিক্ষা। এই'ত গেল পিতামাতার শিক্ষা। সন্তানদিগেরও কর্মশিক্ষা হয়। পিতামাতার সন্নিধানে থাকিয়া ভক্তির শিক্ষা, ভাই ভগিণীর কাছে নিঃস্বার্থতা ও স্থায়পরতার শিক্ষা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্যাতে বিনয় পর-সেবার শিক্ষা, পিতামাতার শাসনে সত্য ও নীতিপরায়ণতার শিক্ষা। এ সকল শিক্ষা পুস্তকের বা মুখের শিক্ষা নহে; বাস্তব ঘটনার সংঘটনে চরিত্রের গূঢ় বিকাশ। এই ত প্রকৃত শিক্ষা। নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিলেই দেখা যাইবে, গৃহ পরিবারের সৃষ্টি মানব চরিত্রকে জগতে কর্মক্ষম করিবার জন্য বিধাতার সম্পূর্ণ বিধান।

'গৃহধর্ম'

জীবনের ধন ধান্য লইয়া জীবন নহে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ ;

জীবনের ধন ধান্য লইয়া জীবন নহে, কে কত উপার্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে ; কিন্তু কে কি চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ অনুসারে চলে, তাহা লইয়া জীবনের বিস্তার। 'গৃহধর্ম'

সমাজের সহিত সহানুভূতি শূন্য স্ত্রীপুত্র কেবল দুঃখের কারণ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ ;

যদি তোমার গৃহিণী দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার পরেন কিন্তু দুঃখীর দুঃখের জন্য তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও জল না থাকে ; যদি তোমার পুত্রকন্যা পদ্ম ফুলের মত সাজিয়া বেড়ায় কিন্তু স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের মূর্তি স্বরূপ হয়, তবে সে ধন পাইয়া তুমি হর্ষ করিবে কি শোক করিবে, তাহা চিন্তা কর। আমি বলি তুমি শোক কর। 'গৃহধর্ম'

পরিবারের প্রতি কর্তব্য।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ ;

সমগ্র সমাজে যে উন্নতি প্রার্থনীয় এক একটি পরিবারে তাহা সাধন করিতে হইবে। বাহিরে যে কিছু সৎ বিষয়ের আলোচনা বা কল্যাণপ্রদ প্রস্তাব চলিতেছে, প্রত্যেক পরিবারের তাহার সহিত যোগ থাকা আবশ্যক। এই কারণে পরিবার মধ্যে এমন একটি স্থান ও এরূপ সময় থাকা প্রয়োজন, যখন সকলে সমবেত হইয়া সর্ববিধ কল্যাণকর প্রস্তাবের আলোচনা করা যাইতে পারে। "গৃহধর্ম"

উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন যোগ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৪ পরগনা নৈহাটিতে বাড়ী ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ; বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ; সাহিত্য সম্রাট।

এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছু মাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ, দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর* সাধারণ উন্নত না হইল, তবে যাহারা শক্তিমন্ত তাহাদিগের উন্নতি কোথায়?

বাংলা ভাষার চর্চা।

পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে এই অমর লেখায় দেশের স্রোত ফিরিল এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা ভাষায় নিজ নিজ উক্তি লিখিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সনে 'বঙ্গদর্শনের' সূচনায় লিখিয়াছেন—"আমরা ইংরেজী বা ইংরেজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি, যতদূর ইংরেজী চলা আবশ্যক তত দূর চলুক, কিন্তু একবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে না। আমরা যত ইংরেজী পড়ি, যত ইংরেজী কহি, যত ইংরেজী লিখিনা কেন, ইংরেজী কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক দিবার সময় ধরা পড়িব। ইংরেজী লেখক,

[illegible] সম্প্রদায় হইতে সকল ইংরেজ ভিন্ন কখন খাঁটি [illegible] সমুন্নতির সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্গদর্শনের সূচনায় তিনি আরও বলেন :—

"ইহা বুঝিতে পারি যে ইংরেজ হইতে এদেশের লোকের যা উপকার হইয়াছে, ইংরেজী শিক্ষাই তাহার প্রধান। অনন্ত-রত্ন প্রসূতি ইংরেজী ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল।

এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সমস্ত কথা ইংরেজীতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যমী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। ঐক্যমতা, একপরামর্শিত্ব একোদ্যম কেবল ইংরেজীর দ্বারা সাধনীয়, কেননা, এখন সংস্কৃত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙালী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী—ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজীভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

মানুষের দুঃখের কারণ তিনটি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানুষের দুঃখের কারণ তিনটি।

(১) কতকগুলি দুঃখ জড় পদার্থের দোষগুণ-ঘটিত। বাহ্য জগত কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে, কতকগুলি শক্তি কর্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্যজগতের অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্য দুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয় সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মানুষ সমাজবদ্ধ হয় সুখী হইবার জন্য; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতি সাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে, দারিদ্র্যদুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্যও নাই।

কতগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ-সংস্থাপনেরই ফল—যথা দারিদ্র্য। এসকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনই সম্ভব হয় না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে সমাজের নিত্যকালের নহে; তাহা নিবার্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্য সমাজ সর্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস, সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

কিন্তু কে অত্যাচার করে? কেন অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি আপনাদেরই উপর অত্যাচার করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি সেই অত্যাচার করে। সেই শক্তি—শাসন শক্তি। সামাজিক কেন্দ্র—রাজা বা শাসন কর্তৃগণ। তাহারাই অত্যাচারী। তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাহারা রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ।

বাহুবল এবং বাক্যবল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কি কি উপায়ে সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে? দুই উপায়—বাহুবল এবং বাক্যবল।

যাহার কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না। এমন প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উচ্চ আপীল এই খানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল: কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশ পশু, এজন্য বাহুবল মানুষের প্রধান অবলম্বন।

অতএব সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে; তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম বাহুবল প্রয়োগ। কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এই উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হন।

বাহুবল মনুষ্য সংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে বাহুবলের কার্য সিদ্ধ করে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল এক মাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুত বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবল পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প,—যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্টসাধন হয় না, এমন নহে। আত্ম রক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। 'বঙ্গদর্শন'

সমদর্শিতা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে সে তাহার দোষে নহে। অতএব, পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দণ্ড, প্রচণ্ড, প্রতাপান্বিত, মহারাজাধিরাজ, প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাহাদের যেন স্মরণ থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষ গুণের নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।

"সাম্য"

পঁচাত্তর বর্ষ পূর্বে নারীজাতির অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষ চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণ কেন করিবে না?

পুরুষে রাজসভায় সভ্য হইবে স্ত্রীলোক কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

লোকে সুশিক্ষিত হইলে বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে এবং এদেশী স্ত্রী পুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিতেছেন? দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লিগ্, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে। কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি কিন্তু স্ত্রী জাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এই জন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাংলার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রী জাতি—তাহাদের উপকারার্থে কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

"বঙ্গদর্শন"

ছুঁৎমার্গ ধর্ম নহে

স্বামী বিবেকানন্দ

(কলিকাতা সিমলায় বাড়ী, এটর্ণির পুত্র; কিন্তু সন্ন্যাসী)

যে ধর্ম গরীবের দুঃখ বুঝে না, মানুষকে উন্নত করে না, তাহা ধর্ম নামের যোগ্য নহে। আমাদের ধর্ম এক্ষণে কেবল 'ছুঁৎমার্গে'

পরিণত হইয়াছে—কাহাকে ছুঁইতে পারা যায়, কাহাকে ছুঁইতে পারা যায় না, তাহারই বিচারে পরিণত হইয়াছে। হা ঈশ্বর! যে দেশের সর্ব প্রধান পণ্ডিতগণ ডান হাতে খাইব না বাঁ হাতে খাইব, এই রূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসায় গত ২ হাজার বৎসর ব্যস্ত আছেন, সে দেশের অধঃপতন হইবে না ত হইবে কাহার।

'চিঠি'

মুচির ছেলের আর শূচি হইবার উপায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের দেশে যদি কারুর নীচ কুলে জন্ম হয়, তবে আর তার কোনও আশা ভরসা নাই—সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু? এ কি অত্যাচার! আমেরিকায় সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগতমান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেণ্ট্ হইবার আশা রাখে। আর আমাদের দেশে? Once a cobbler, ever and always a cobbler—মুচির ছেলে ছাপান্ন পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তার আর কোনও উচ্চ আশা নাই—থাকিতে পারে না। কারণ এদেশে মুচির ছেলের আর শূচি হইবার উপায় নাই।

"চিঠি"

ডাঃ আম্বেদকার এম্, এ; পি, এইচ, ডি; ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন্ সভার অধিপতি। তিনিও একজন চর্মকার।

ভবিষ্যৎ ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

"এই সেই প্রাচীন ভূমি অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রিয় বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; এই সেই য যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর-সদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিম-শিখররাজির দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্যনিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষিমুনিগণের চরণ-রজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল—এখানেই মানব-মন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল। এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ-সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত হইতেও দৃঢ়তরভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ আমাদের এই ভারতভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারত-সন্তানগণ আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি; আর ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য—কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্যের আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে লোকে অনেকবার বলিয়াছে পূর্ব গৌরব-স্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র উহাতে কোন ফলোদয় হয় না—সুতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তার পর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব-শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর উজ্জ্বলতর মহত্তর মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদিগকে প্রথমে ইহা জানিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাস-বলে সেই অতীত মহত্ত্বের জ্বলন্ত ধারণা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে। আমি উহা বড় ধর্তব্যের মধ্যে আনি না: আমরা সকলেই সে-কথা জানি—উহারও আবশ্যকতা ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ব ফল জন্মিল—সেই ফল মাটিতে পড়িয়া পচিল—তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয়ত প্রথম বৃক্ষ হইতেও মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল। এইরূপ যে অবনতির যুগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে তাহারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই অবনতি

হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে উহার নব-পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান প্রকাণ্ড ঊর্দ্ধমূলম্ বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—আর আমি অদ্য তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এ দেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতীয় অবান্তর বিভাগ, ধর্ম ভাষা, শাসনপ্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি একটি করিয়া জাতি লইয়া এই জাতির সহিত তুলনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, অন্যান্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক। আর্য দ্রাবিড়ী তাতার তুর্ক মোগল ইউরোপীয়—যেন জগতের সকল জাতির শোণিত এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব্ব সমাবেশ—আর আচার ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখা-জাতির যে প্রভেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পবিত্র পরম্পরাগত উপদেশ, আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্য-সাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্ব্বত্র এক ধর্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম—একথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খৃষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে 'এক ধর্ম' কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উঁহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব

আমাদের সম্প্রদায়সমূহের এইরূপ কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আর আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক—সকলেই সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কার্য। আমরা দেখিতে পাই—এশিয়ায় বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা, সমাজ-সম্বন্ধীয় সমুদয় বাধা ধর্মের সম্মিলনকারিণী শক্তির নিকট উড়িয়া যায়। আমরা জানি ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর ইহাও আমরা জানি, আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে সমর্থ।

বন্ধুগণের প্রতি চিঠি।

স্বামী বিবেকানন্দ

আর তোমরা কি কচ্ছো? সারা জীবন কেবল বাজে বক্‌ছো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর—যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাহিরে গেলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রম বর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে

শক্তি ক্ষয় করছ। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুর-পাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা বল দেখি—আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদ্‌হজম খানিকটা ক্রমাগত আওরাচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মৎলব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশেপাশে এক পাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ, বাবা খাবার দাও, খাবার দাও, করে, উচ্চ চীৎকার তুলেছে। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, বই গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না? *

"চিঠি"

রাজনীতি দর্শন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়, পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) সৈনিক (ক্ষত্রিয়) ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র; Labour)। প্রত্যেক শাসনের দোষগুণ উভয়ই বর্তমান।

পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সঙ্কীর্ণ রাজত্ব করে—তাহাদের বংশধরগণের অধিকার জন্ত চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,

তাহারা ব্যতীত বিদ্যা শিখিবার কাহারও অধিকার নাই। এ যুগের মাহাত্ম্য ইহাই যে, এই সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়; কারণ, বুদ্ধি বলে অপরকে শাসন করিতে হয় বলিয়া পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করেন।

ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই অত্যাচারপূর্ণ ও কঠোর, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নহেন। এই যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। ইহার ভিতরে ভিতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী (exploiting) ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ। এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকালের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয় যুগ হইতে বৈশ্য যুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হইতেই সভ্যতার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

সর্বশেষ শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হইবে—এই যুগের সুবিধা হইবে এই যে, এ সময়ে নানা রূপ শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার বিস্তার হইবে, কিন্তু হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অবনতির দোষ ঘটিবে—সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়িবে বটে, কিন্তু সমাজে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ কম হইতে থাকিবে।

এক্ষণে ইহা ঠিক যে, প্রথম তিনটির পালা শেষ হইয়াছে—এইবার শেষটির সময়। শূদ্র যুগ আসিবেই আসিবে—কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবেনা।

স্বর্ণ মুদ্রার মূল্যে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবেরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হইতেছে। রূপার দরে সব দর ধার্য হইলে গরীবেরা এই অসমান জীবন সংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাইবে। আমি যে একজন সোশিলিষ্ট (Socialist) তাহার কারণ

ইহা নয় যে আমি এই মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে করি, কেবল "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল"—ইহা বলিয়া।

"পত্রাবলী"

আমায় মানুষ কর

স্বামী বিবেকানন্দ

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে, তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবর্ষ, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বারানসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ

হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

"পত্রাবলী"

শাশ্বত ভারত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ-কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ* জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐকান্তিক বিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্র-গৌরবলাভকে জীবনের চরম বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা

বিরোধমূলক। ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়।......হয় পরকে কাটিয়া—মারিয়া—খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যস্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া

রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি; গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

সামাজিক অন্ধতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নরহত্যা করিয়া সমাজে নিস্কৃতি আছে, কিন্তু গো হত্যা করিয়া নিস্কৃতি নাই। অন্যায় করিয়া যবনের অন্ন মারিলে ক্ষমা আছে কিন্তু তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে পাতক। যে পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে লোক পূজা অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্ত জানে না, তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠা বোধ করিনা।

"সমাজ"

মানবের স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে ক্ষমতার কাছে মস্তক নত করিলে মস্তকের অপমান হয—যেমন টাকা, পদবী, গায়ের জোর এবং অমুলক প্রথা, যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তির প্রসারণ না ঘটিয়া কেবল সংকোচ ঘটে, তাহার দুর্দান্ত শাসন হইতে মনকে স্বাধীন ও ভক্তিকে মুক্ত করাই মনুষ্যত্বের প্রধান সাধনা।

"সমাজ"

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষা তত্ত্বটাকে নূতন করে আমাদের ভাবিতে হবে। সেই ভাববার প্রধান বাধা এই যে, আমরা পৃথিবীতে মনন ব্যাপারে যে Solitary Cell এর মধ্যে বন্দী আছি, তার মধ্যে বসে আমাদিগের মনে হয়,

কেউ বুঝি কোথাও পুরানো জিনিষকে নতুন করে ভাবছে না। সেই জন্য আমাদের ভাবতেই ভয় হয়। নিজের দেশের সৃষ্টির গোড়াতেই একেবারে চতুর্মুখের মগজে চিন্তিত হয়ে, তাঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে বেরিয়েছে বলে ঠিক করে বসে আছি,—পরের দেশের শাস্ত্রকেও আমরা অচল ঠাটে বাঁধা অবস্থায় ধ্যান করি—এটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে। ওটা আমাদের মজ্জাগত মনের কুঁড়োমি। কিন্তু কুঁড়ে লোকের প্রথম শিক্ষা হচ্চে, তাকে জানান যে পৃথিবী সুদ্ধ সবাই কুঁড়ে নয়—মানুষের মন ছয় দিন সৃষ্টি করে সাত দিনের দিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বল্‌ছে না যে, তোফা হয়েছে—সৃষ্টির মধ্যে আরো—ভালোর ডাক কোন দিন থামেনি এবং কোন দিন থামবে না।

আমাদের ইস্কুল মাষ্টার আমাদের শিখিয়েছে যে, মনের ধর্ম মুখস্থ করা—আমাদের এমন দৃষ্টান্ত জরুর চাই, যার থেকে বুঝতে পারি, মনের ধর্ম ভাবা।

"শিক্ষা"

সওগাত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসী কাপড়, কত সোনার অলঙ্কার; আর ভাণ্ড ভ'রে ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়ো ছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজো ছেলে সওদাগর, ঘরে থাকেনা; আর কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ী করেছে। কুটুম্বেরা আছে দেশ-বিদেশ ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ধ'রে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাস দাসী, থালাগুলি রঙ-বেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষ নৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্র লোকের পথে নিরুদ্দেশ হোলো।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, "মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।"

মা হেসে বললেন, "সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কি বাকী রইল, দেখ।

এই ব'লে তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদো—কাঁদো সুরে বললে—"সওগাত পাব না?"

"যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।"

"আর যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিষ দিবি নে?"

মা তাকে দু—হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বল্লেন, "এই তো আমার হাতের জিনিষ।"

"লিপিকা"

বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে, কিন্তু উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব, গোলাম, এই তিনটাই প্রধান বর্গ, নহলা দহলরা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার যো নাই। সকলেই যথা নির্দিষ্ট মতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলী ক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিযমে যাওয়া—আসা, নিযমে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্ত তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপমারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনও কাহাকেও চিন্তা করিতে হয়না, বিবেচনা করিতে হয়না; সকলেই যেন নির্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্ করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এক কালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত, ভিতর হইতে পাখীর শব্দ ও গান শুনা যাইত। গভীর

অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহ শলাকাগুলোই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে, কে বলিতে পারে।

আশ্চর্য স্তব্ধতা এবং শান্তি। পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত সুবিহিত—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীল পক্ষের মতো আকাশ দিগদিগন্তের শান্তি রক্ষা করিতেছে। অতি দূরে পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

(২)

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়োরাণীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে। সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগদিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ঐ ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায়, কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথায় মাণিক, পারিজাতপুষ্প, সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম

দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা, আলোক সুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বলো। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

এক দিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—সাঙাৎ, পড়া শুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব, তাই বিদায় লইতে আসিলাম।

রাজার পুত্র কহিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র কহিল, আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমার সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

(৩)

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয় বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খ দ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দনদ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসর গজদন্ত, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জায়ফল—যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।

সব ক-টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, ও তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলাগুলোও তাহাদের পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

(৪)

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এত দিন পরে এই একটা তর্ক উঠিল—এই তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা হইবে?

প্রথম ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন, চিড়েতন, হরতন অথবা রুইতন?

এসমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোও রূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকার ভেদে কেই বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা-রাখিয়া এবং কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এত বড়ো বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধা কাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে ছুরি তিরি পর্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল, ভাই ছুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। ছুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচ জাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলো কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা এক প্রকার হতবুদ্ধি ভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুতলা—বাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মতো। তাই কাহারও মুখে ভাব নাই ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জিবতার মধ্যে পরম গম্ভীরতার রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাস রাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এমনি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্বাপিত হইয়া গেল—চারিদিকের লোক প্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল, ভাই সাঙাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়। এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।

রাজপুত্র কহিল, না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে—ইহারা মানুষের মতো দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কিনা একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।

(৫)

এমনি তো কিছু দিন যায়। কিন্তু এই তিনটি বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। সেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফিরানো, উপুড় হওয়া; চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য আছে ইহারা তদ্বারা অভিভূত হয় না।

এক দিন টেক্কা সাহেব ও গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের, সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বিধান মতে চলিতেছ না কেন?

তিন বন্ধু উত্তর করিল, আমাদের ইচ্ছা।

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজ্যের অধিনায়ক স্বপ্নভূতের মতো বলিল "ইচ্ছা! সে বেটা কে?"

ইচ্ছা কী সে দিন বুঝিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। তাহারা প্রতিদিন দেখিতে লাগিল এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে, তেমনি ওদিকও আছে। বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল, বিধানের মধ্যেই

মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এম্‌নি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক এক রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অম্‌নি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলো কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে, সেই রূপ।

"গল্পগুচ্ছ"

দাদা নাতির মধ্যে চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

চিরঞ্জীবেষু

ভায়া নবীন কিশোর, এখনকার আদব কায়দা আমার ভাল জানা নাই—সেই জন্য তোমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ, বা চিঠি পত্র আরম্ভ করিতে কেমন ভয় করে। আমরা প্রথম আলাপে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু শুনিয়াছি, এখনকার কালে বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা দস্তুর নয়। সৌভাগ্য ক্রমে তোমার বাবার নাম আমার অবিদিত নাই, কারণ তাহার নামকরণ করিয়াছিলাম। ভাল নাম দিতে পারি নাই—'গোবর্দ্ধন' নামটা হঠাৎ মুখে আসিল সেই টাই দিয়া ফেলিয়াছি। সেই জন্যই বোধ হয় সে দিন ন্যায়রত্ন মহাশয় তোমাকে তোমার ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তোমার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তা তুমিই না হয় তোমার বাবার নূতন নামকরণ কর। আমার গোবর্দ্ধন নাম আমি ফিরাইয়া লইতেছি। আমরা মনে করিতাম, নামে মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে জাকাইয়া

তোলে। মন্দ কাজ করিলেই মানুষের বদ্‌নাম হয়, ভাল কাজ করিলেই মানুষের সুনাম হয়। বাবা কেবল একটা নামই দিতে পারেন, কিন্তু ভাল নাম কিংবা মন্দ নাম সে ছেলে নিজেই দেয়।

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তোমাকে কি পাঠ লিখিব এই ভাবনা মনে উদয় হয়। একবার ভাবিলাম লিখি 'মাই ডিয়ার নাতি' কিন্তু সেটা আমার সহ্য হইল না। তার পর ভাবিলাম 'আমার প্রিয় নাতি' সেটাও বুড়ো মানুষের থাক্‌ড়ার কলম দিয়া বাহির হইল না।

তোমাদের ভাল হৌক ভাই, আমরা এই চাই। তোমরা আমাদের প্রণাম কর আর না কর, আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তোমাদের আছে। ভক্তি করিতে যাহাদের লজ্জা বোধ হয়, তাহাদের কোন কালে মঙ্গল হয় না। বড়র কাছে নীচু হইয়া আমরা বড় হইতে শিখি—মাথাটা তুলিয়া রাখিলেই যে আমরা বড় হই তাহা নয়। পৃথিবীতে আমার চেয়ে উচু আর কিছু নাই, আমি বাবার জ্যেষ্ঠতাত, আমি দাদার দাদা এইটে যে মনে করে, সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

পূর্বে বলিয়াছি এখনকার আদবকায়দা আমার বড় জানা নাই। এখন বাপকে প্রণাম করিতে লজ্জা বোধ হয়, বন্ধুবান্ধবকে কোলাকোলি দিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, গুরুজনের সন্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া তাস পিটিতে লজ্জা বোধ হয় না। রেলগাড়ীতে যে বেঞ্চে পাঁচ জন বসিয়া আছে তাহার উপর দুই পা তুলিয়া দিতে সঙ্কোচ হয় না।

হৃদয় ঢালিয়া তোমাকে স্নেহ দিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার আছে। তুমি হয়ত দু পাঁচখানা ইংরেজী বই বেশী পড়িয়াছ তাহাতে বেশী কিছু আসে যায় না। আঠার হাজার ওয়েব্‌ষ্টার ডিক্‌স্‌নারির উপর যদি চড়িয়া বস, তাহা হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নীচে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও আমার হৃদয় হইতে আশীর্বাদ নামিয়া তোমার মাথায় বর্ষিত হইতে থাকিবে।

তুমি যখন আমার চিঠির উত্তর দিবে প্রণাম পূর্ব্বক চিঠি আরম্ভ করিও। তুমি হয়ত বলিয়া উঠিবে 'আমার যদি ভক্তিশ্রদ্ধা না হয় তবে আমি কেন প্রণাম করিব।' এসব অসভ্য আদব কায়দার আমি কোন ধার ধারিনা। তাই যদি সত্য হয় তবে কেন ভাই তুমি বিশ্বসুদ্ধ লোককে "মাই ডিয়ার" লেখ। আমি বুড়ো, তোমার ঠাকুরদাদা, আজ সাড়ে তিন মাস ধরিয়া কাশিয়া মরিতেছি, তুমি একবার খোঁজ নিতে আস না। আর জগতের সমস্ত লোক তোমার এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে "মাই ডিয়ার" না লিখিয়া থাকিতে পার না। তুমি বলিতে পার আমি হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া চলিব। তাই যদি তোমার মত হয়, সুন্দরবনে গিয়া বাস কর, মনুষ্য সমাজে থাকা তোমার কর্ম নয়। মানব সমাজ কর্তব্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমার কর্তব্য আমি না করিলে তোমার কর্তব্য তুমি ভাল রূপে করিতে পার না। দাদা মহাশয়ের কতকগুলি কর্তব্য আছে, নাতিরও কতকগুলি কর্তব্য আছে। তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার কর তবে আমিও আমার কর্তব্য ভাল রূপে সম্পন্ন করিতে পারি।

আশীর্বাদক—

শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ

দাদা নাতির মধ্যে চিঠি

(২)

শ্রীচরণেষু,

শ্রীচরণকমল যুগলেষু, আরও ভক্তি চাই, যুগলের উপরে আরও এক যোড়া বাড়াইয়া দিব! দাদা মহাশয়, তোমার অন্ত পাওয়া

ভায়, চিরকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিয়া আসিয়াছ, আজ হঠাৎ ভক্তি আদায় করিবার জন্য আমাদের উপর এক পরওয়ানা পত্র বাহির করিয়াছ, ইহার অর্থ কি! আমি দেখিয়াছি যে, তোমার সুমুখের এক যোড়া দাঁত পড়িয়াছে সেই অবধি তোমার মুখে কিছুই বাধে না। তোমার দাঁত গিয়াছে বটে কিন্তু তীব্র ধারটুকু তোমার জিহ্বার আগায় রহিয়া গিয়াছে।

তোমাদের কালের সবই ভাল, আমাদের কালের সবই মন্দ, এইটি তুমি প্রমাণ করিতে চাও। যে লোক যে কালে জন্মগ্রহণ করে সে কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে কালের উপযোগী কাজ সে ভাল করিয়া করিতে পারে না। যদি সে মনে করে যে কাল গেছে তাহাই ভাল, আর আমাদের কাল অতি হেয়, তবে তাহার কাজ করিবার শক্তি চলিয়া যায়, ভূত কালের দিকে শিয়র করিয়া কেবল স্বপ্ন দেখে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। মিউজিয়মে প্রাচীন কালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে। পরিবর্তন মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, যেটুকু গুণ আছে, তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি আমরা সত্যই জলে পড়িয়া থাকি তবে সেখানে ডাঙ্গার মত চলিতে চেষ্টা করা বৃথা. সাঁতার দিতে হইবে।

সেব

শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ

দাদা নাতির মধ্যে চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

চিরঞ্জীবেষু

আমি ত ভাই ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে দেশের আব্‌হাওয়ায় বেশী মশা জন্মায় সেখানে বড় জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলা জমি, জঙ্গল, এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীর গুলি কেবল ভাঙ্গিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিয়াছে কিন্তু উপায় নাই—কাজ বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু শরীর নাই—অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—তাহার পরিবর্ত্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভাল—আমাদের স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্ম্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজন বৎসল পুত্র কন্যা, পরিবারপ্রতিম পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভাল। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ উপকরণ সকল আমরা কোথায় পাইব। কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট। অবিশ্রাম কর্ম্মানুষ্ঠান—বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ—নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন—অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দাহন—সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত অর্দ্ধসিক্ত দেশে জীর্ণশীর্ণ দুর্ব্বলদেহে পারিব কেন? কেবল

আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া পতঙ্গের মত উগ্র সন্তাপানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।

আশীর্বাদক

শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্মন:

দাদা নাতির মধ্যে চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

শ্রীচরণেষু,

তবে সমস্ত চুলায় যাক্। বাংলাদেশ তাহার আম কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতে থাকুক। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক, মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ কর, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন ও আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্বক স্থগিত কর, ইংরেজী পড়া একেবারেই বন্ধ কর, বিজ্ঞান শিখিও না, যে সমস্ত মহাত্মা মানব জাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের ইতিহাস পড়িও না, পৃথিবীর যে সকল অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানব জাতিকে বিনাশ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া থাক। অর্থাৎ যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে কাজ করিবার জন্য অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হয়—সে সমস্ত হইতে দূরে থাক। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়, কোন্ দিন বার্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতি দিন সমালোচনা কর। দালান, ডাবাহুঁকা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্রতাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন অতিবাহিত কর।

দাদা মহাশয়, তুমি কি সত্য সত্যই বলিতেছ—আমরা একশত বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিলাম, অবিকল সেই রূপ থাকাই ভাল, আর কিছু মাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই? জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞান লালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে! তুমি পরামর্শ দিতেছ, ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাক, গৃহের দ্বার রুদ্ধ কর, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রী, পুত্র পরিবার প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে নিদ্রার আয়োজন কর।

কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া বৃথা—সাবধান করা নিস্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আজ আমরা সমস্ত মানবজাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিয়াছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিস্ফল। বঙ্গসমাজে গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না! মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু! তোমার উপদেশে আমি ত বল ও বুদ্ধি পাইতেছি না। আমার যেটুকু বল ও বুদ্ধি আছে তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম। মরিতে হয় চিরজীবন সমুদ্রে ঝাপ দিয়া মরিব।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্মন:

"সমাজ"

যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নহেন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখুন পরেশবাবু, কাল রাত্রে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, যে আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নূতন জীবন লাভ করি।

এতদিন শিশুকাল থেকে আমাকে যে কিছু মিথ্যা, যে কিছু অশুচিতা, আবৃত ক'রে ছিল, আজ যেন তা নিঃশেষে ক্ষয় হ'য়ে গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ করি। তিনি এমন ক'রে আমার অশুচিতাকে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হ'য়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতায় ভয় রইল না। পরেশবাবু আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ট হ'য়েছি—মাতৃকোল যে কাকে বলে, এতদিন পরে তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

গোরা শেষে কহিল—"আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেই জন্যই আজ কোন সমাজেই স্থান পান নাই। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন। গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

গোরা কহিল—"তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

তখন আনন্দময়ী অশ্রুব্যাকুল কণ্ঠে, মৃদুস্বরে গোরার কানের কাছে বলিলেন—"গোরা এই বার একবার বিনয়কে ডেকে পাঠাই।" "গোরা"

কেবল মাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়ঃ একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নাই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপবাসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা, সব কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোন উপায় নেই। একদল লোক তলায় না থাকলে আরেক দল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না;—কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে

নয়, শরীর-মনের শক্তিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য—সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোন স্থায়ী জিনিষ করা চলে না। বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্‌কার আসে।

ভেবে দেখনা, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড় হয়ে উঠে মানবসমাজে বড় কাজ করেছে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চিরকালের মত একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে, তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাহাদের মনে জাগে। কিন্তু একশত বৎসর হয়ে গেল, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে-মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না, সে-মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্ততঃ যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁসে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি। কিন্তু আপাতত যাহা চোখে পড়ছে তা দেখে

আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোন মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্য কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্দম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্য নয়—মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে। সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্য প্রয়াসের অন্ত নাই। এখানে থিয়েটারে অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই—ইংলণ্ডের মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশপাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তা করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছু দিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তাহলে ভারী উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারতো! কয়েক বর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জন সাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্প কালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

"রাশিয়ার চিঠি"

যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলোক ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে বৃটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা বিধানের ত্রুটি। আর কিছু বলার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি, এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিষপত্র কেবলি হারায়, তারপরে খুঁজে পায় না, ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে, নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়—কেবলি বিছানা আঁকড়ে পরে থাকে, উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই, খিদে পায় কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না, অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত—অতএব গৃহস্থালীর তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না—তারপর সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয়, আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি, তা হলে সেটা কেমন হয়।

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ

উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছে; বর্তমানে তুরস্ক প্রবল বেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করার পথে চলেছে। "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"। কেন না ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি, যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে, সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

'রাশিয়ার চিঠি'

মানবের অপমানে বিধাতার অপমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার লজ্জা বোধ হয় যে, মানুষকে মানুষ ভালবাসে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র, এত প্রমাণ ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজাব হাজার বৎসর ধরে এদের পেছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে রেখেছি—আমরা শিক্ষিতেরা। আজ কি তাদের এত করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলতে হবে? যারা যুগে যুগে অপমানিত হয়ে এসেছে, তাদের কাছে আজ আমার শেষ অনুরোধ যে, তারা উঠে দাঁড়াক, তারা জোর গলায় বলুক যে আমরা অপমানিত—আমরা মানুষ, মানুষের অধিকারে দাবী করবার দিন আজ এসেছে। হাজার হাজার লোকের দাবী, ও শক্তি একত্র যদি হোতো, তবে দেশের এ দুর্ভাগ্য আজ ঘটত না। আজ আমরা তাদের অপমানিত করে রেখেছি, সেই দুর্বলতাই সব দেশকে মারছে। আমরা যখন ভারত সরকারের কাছে আমাদের অধিকার দাবী করব, তখন দেখলেম্ আমাদের মিল নেই। অনেক বিলম্ব হয়েছে; আজ মিলতেই হবে, নতুবা এ দেশের আর

কোন মুক্তির পথ নেই। এতে চিরকাল বিদেশীর পদানত হয়ে থাকতে হবে। মানবের অপমানে বিধাতার অপমান করেছি, সেই জন্য পৃথিবীর লোক আজ আমাদের অপমান করতে সাহস পেয়েছে। আমরা যদি একবার হাতে হাত ধরে বলতে পারতেম, আমরা মিলেছি, তাহলে এত অবজ্ঞা, এত পীড়ন আমাদের পেতে হোতনা বাইরের থেকে। আমরাই আমাদের অপমান করেছি, আমাদের সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। বিদেশীদের দোষ দিই বৃথা। যে অস্ত্র আজ আমাদের মারছে, সে আমাদের অন্তরের মোহান্ধতা—বিদেশীর অস্ত্র নয়।

মানুষকে যত দূরে ফেল্‌ব তত শক্তি যাবে। আজ আমাদের শক্তি চাই। পিছে পড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। পৃথিবীর অন্য সব দেশ আজ মাথা তুলে তাদের বিজয়গর্ব প্রকাশ করছে। শুধু ভারতবর্ষ চাপা পড়ে আছে। দেশের লোককে সম্মান দিতে পারিনি। সেই মূঢ়তাই আমাদের চেপে রেখেছে। একত্র হৃদয় দিয়ে দাঁড়াতে পারলে এই দুর্ভাগ্য হোত না।

আজ অবনত কারা? আমরা কি উন্নত? এই শিক্ষিত সমাজ আমরা? বিদেশীর লাথি ঝাঁটা কঠোর ভাবে আমাদের উপর পড়ছে; ওদের কাছে আমরা অবনত। তাই সকলের সঙ্গে আমরা সমান অনুন্নত, সমান দুঃখ, অপমান আমরা পেয়ে আসছি। আজ সময় এসেছে, যে অপমান দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিব্যাপ্ত, সেই অপমানকে ঝেরে ফেলে পরস্পরকে ভাই বলে বুকে তুলে নিতে হবে।

আজ আমরা ওদের মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার দিই নি, কিন্তু আকাশের তলাতে যে মন্দির, চন্দ্র, সূর্য যে মন্দিরে প্রদীপ

জলে, সেই মন্দিরে সকলকে এক করে নিতে হবে। আমরা মনে করি, পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা মন্দিরে তাদের না প্রবেশ করতে দিলে আমাদের সম্মান বজায় রইল। সে মন্দির না দেশের কারাগার? যারা ঘণ্টা নেড়ে আচার অনুষ্ঠান মেনে পূজা করছে, ভগবানের মন্দির থেকে নির্বাসিত তারাই। যারা আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিশ্বদেবতার চরণে প্রণাম জানাতে পেরেছে তারাই আজ অস্পৃশ্য।

"শ্রীনিকেতনে বক্তৃতা"

রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই, রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনভিগম্য বিস্মৃত প্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপন করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা

হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিলনা। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য কি বিজ্ঞান কি ইতিহাস কি ধর্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়ার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু সাহিত্যে মহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয়পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের এক তারে বাঁধা ছিল—কেবল সহজ সুরে ধর্ম সঙ্কীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রামসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

'আধুনিক সাহিত্য'

প্রাণটা দিব এবং সুখটা চাই না—উভয়ই শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণটা দিব, একথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না, একথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে, "চাই"। নয়, বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে, "চাই না"। "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই;—এমন ধিক্‌কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

পরের উপকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে—ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোন যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবল মাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

ডায়ারি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাক বাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ সহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সহুরিক ভাব বড়ো নাই। গলি ঘুজি, আবর্জনা, নর্দমা, ঘেঁসাঘেঁসি, গোলমাল, গাড়ি ঘোড়া, ধূলো কাদা, মাছিমশা, এ সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে সহরটি তকৃতক্ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুর বেলা। ডাক বাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। এক রকম মেঠো মেঠো ঘেসো ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিখ পাখী বারান্দায় আসিয়া চকিত ভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গরু লইয়া যাইতেছে। তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুংঠুং শব্দ শুনিতেছি। লোক জনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাঁধে মোট লইয়া, কেউ দুয়েকটা গরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরে সুস্থে চলিতেছে। কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। দেখিলে মনে হয়, এখানকার মানব জীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁস ফাঁস করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুলুকুলু করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে।

সম্মুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোর মূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শ্যামলায় শ্যামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথ গাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছে। বিচার প্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাড়াইয়া প্রতি ঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে, "আর কেহ জাগুক না জাগুক, আমি জাগিয়া আছি।" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়, আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

"পাঠ সঞ্চয়"

লাইব্রেরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহা সমুদ্রের, শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাসমুদ্রের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে, কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা

আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব মনের,—হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! বিদ্যুতকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত, মানুষ সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

"পাঠ সঞ্চয়"

বরপণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে, নির্মম ভাবে, দরদাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান, তাহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাটিবার চেষ্টা করেন, তবে লাভ কী? প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসার ভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব করুন, তবেই লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্খাই সর্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, সেই গৃহকে

যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

"পাঠ সঞ্চয়"

মানুষের গৌরব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষের অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়! প্রতিদিন আমরা যে অন্ন গ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উদ্যম, মানুষের উদ্যোগ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব এক দিনের জন্যও নাই; মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—গাত্রবস্ত্র মানুষের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ট হয় নাই, আপন শক্তিব দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে। কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণী সমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানব শক্তির গৌবব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন—তাহাকে নিজের পূর্ণ শক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

"পাঠ সঞ্চয়"

মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার শেষ রাজনীতির দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

"শান্তিনিকেতন পত্রিকা"

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

(১)

বিপিনচন্দ্র পাল

[মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্ট নিবাসী ছিলেন, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) উপস্থিত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতায় বঙ্গদেশ মুখরিত ছিল।]

বাঙ্গালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনীষিগণ বাংলায় যে চিন্তা ও ভাবকে তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকার বাঙ্গালী যুবকেরা কেবল নহেন—অনেক বৃদ্ধেরা পর্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না, বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিস্পন্দ; ভাবের স্রোত বন্ধ, বাংলার যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা, ভাব ও কর্ম ভাণ্ডারে বাংলার আর কিছু দিবার থাকিবে না।

এই বিশেষত্বই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্মে, বাংলার সাহিত্য ও শিল্প-কলায়, বাংলার সমাজ-জীবনে —সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক নহে, অতি পুরাতন; যতদিন বাঙ্গালীর সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব তিলে তিলে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া এই বিশেষত্বর মধ্যে যাহা সার্বজনীন তাহাকে বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য। বাংলা, পঞ্জাব বা মাদ্রাজ গুজরাট বা অন্ধ্র নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থান ভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না; আর যাহার বিশ্বকে কিছু দেয় থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্নরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের উপর দাবী থাকিবেনা—সে বাঁচিল কি মরিল, কি ভারতের কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই আজ বাঙ্গালীকে সকলের আগে বুঝিতে হইবে।

'বঙ্গবাণী' (অধুনা লুপ্ত মাসিক পত্র)

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

(২)

বিপিনচন্দ্র পাল

কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে সর্বত্র হিন্দু বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়াই সাম্যের, স্বাধীনতাকে বজায় রাখিয়াই ঐক্যের, ব্যষ্টির

থ, ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মচরিতার্থতার পথ অবাধ রাখিয়াই সমষ্টির রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিলেন তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মতবাদের বিরোধ সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান সাধনার সার্বজনীন সত্যকে আপনার করিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে,—বিশেষত এই বাংলাদেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুরা অকুণ্ঠভাবে মুসলমানের দরগায় সিন্নি দিতেন এবং মুসলমানেরাও সরল ভক্তিভরে হিন্দু দেবদেবীর নিকট বলি আনিয়া দিতেন। মুসলমান যুগে এই রূপে হিন্দু-মুসলমানের একটা সমন্বয় সাধনের বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই—নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্বজনীন সাধনা এবং মানবতার উদার ভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আর সে চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় নাই—এখনও জোর করিয়া বলা চলে। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism নামে অভিহিত করিয়াছে। এই আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্যতার, স্বাতন্ত্র্যের সহিত ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতার সমন্বয় সাধন হইতেছে। এই আদর্শের সন্ধান ইউরোপ সবে মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পথ ভারতের চির পরিচিত পথ।

'বঙ্গবাণী'

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য

(৩)

বিপিনচন্দ্র পাল

বাংলা চিরদিন, কি সমাজের, কি ধর্মের—সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতা অন্বেষণ করিয়াছে; প্রাচীন

শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্রবন্ধনকে সর্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যে কালে পুরাতন স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখনও স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দু সমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু সমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় বিপ্লব ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। ব্যবহারশাস্ত্র ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীন কাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজী একাদশ শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের ভট্টনারায়ণের বংশধর ব্যবহারবিদ্‌ ও স্মার্তশিরোমণি জীমূতবাহন বাঙ্গালী হিন্দুর দায়াধিকার নির্ণয় করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দায়ভাগ কেবল বাংলায় হিন্দু সমাজেই প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ মিতাক্ষরার অধীন; মিতাক্ষরায় ধনীর নিজের ধনের উপরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই। দায়ভাগে ধনীকে, তাহার মৃত্যুর পরে বা পূর্বে, স্বেচ্ছামত নিজের ধন সম্পর্কিত বা অসম্পর্কিত যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার দিয়াছে। এ বিষয়ে কোন প্রকারের বাঁধাবাঁধি নাই। জীমূতবাহনই যে নিজে ইহা সৃষ্টি করেন এইরূপ বলা যায় না। সমাজে যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের গতি ও প্রকৃতি যে দিকে চলিতেছিল, তাহার উপরই তিনি আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূতবাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন দায়তত্ত্ব প্রচার করিয়া জীমূতবাহনের দায়ভাগকেই কোনও কোনও বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা আরও উদার করিয়া ফেলেন। মিতাক্ষরা অনুসারে, সম্পত্তি সমগ্র পরিবারে, সমষ্টিভাবে আবদ্ধ থাকে; পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা পারিবারিক সম্পত্তির নিজ নিজ অংশ পরিবারের অন্যান্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করিতে পারেন না।

দায়ভাগ অনুসারে, বাঙ্গালী হিন্দুর এ অধিকার আছে। ইহাতে বাংলার হিন্দুসমাজে অর্থব্যবহার সম্বন্ধে এমন একটা স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়, যাহা মিতাক্ষরার অধীন হিন্দু সমাজে হয় নাই। মেইন সাহেব (Maine) কহেন যে, বাংলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্য প্রধান দেশ ছিল বলিয়াই, মিতাক্ষরার বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাহার সহ্য হয় নাই। জীমূতবাহন কহিয়াছেন যে, শত শাস্ত্র বচনের দ্বারাও বস্তুর পরিবর্তন সম্ভব নহে। ইহাতেই বাংলার মনীষার স্বাধীনতা প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গবাণী'

জ্ঞান বা ভক্তি কোনো শ্রেণী বিশেষের এক চাটিয়া সম্পত্তি নয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি;

(খুলনা জেলার জমিদারের সন্তান। নিজে অবিবাহিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিজ্ঞান কলেজ তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল। দেশপ্রাণ ও ছাত্রদিগের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন)

শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ট দাসীপুত্র ছিলেন এবং মহর্ষি ব্যাস ধীবরের কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অত দিনের কথারই বা কাজ কি? মুসলমান অধিকারের সময়েও ভারতবর্ষে শূদ্র তুকারাম, জোলা কবির, মুচি রুহিদাস এবং মাদ্রাজের অত্যাচারিত পঞ্চমা শ্রেণীভুক্ত সাধুগণের কাহিনী পড়িলে বুঝা যায় জ্ঞান বা ভক্তি কোনো শ্রেণীবিশেষের এক চেটিয়া সম্পত্তি নয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোকেই যে দেশে শিক্ষার অধিকার ও উন্নতির সুযোগ লাভ করিয়া থাকে, সেই দেশই অচিরে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। "প্রবন্ধ ও বক্তৃতা"

বৌদ্ধ যুগই ভারতের উন্নত যুগ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সর্ব প্রকার বিভেদ ভুলে গিয়ে আপামর সাধারণের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধ যখন নূতন সত্যের প্রচার আরম্ভ করলেন—সেই প্লাবনের যুগে ব্রাহ্মণাধিকার তিরোহিত হ'য়ে ভারতবর্ষে সব একাকার হয়ে গেল। সেই ভাববন্যা হ'তে যে যুগের উদ্ভব হ'ল, ভারতবর্ষের সে এক শ্রেষ্ঠ যুগ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বিদ্যা ও বিজ্ঞান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হ'ল; মগধ সাম্রাজ্য (বিহার) ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মহারাজ অশোকের সময় দেশবাসীকে এক নূতন জীবনের আস্বাদ প্রচার করল। সে জীবনে জাতিভেদ এক প্রকার বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিবাহাদির স্বচ্ছন্দ আদান প্রদানে বিভিন্ন জাতি মিলে মিশে এক হয়ে গেল। "বক্তৃতা ও প্রবন্ধ"

জ্ঞান তপস্বী কই? বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ফল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েট জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাকরি করছেন, তারও অধিক স্কুল মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হয়ে বাহির হয়েছেন। মাদ্রাজ উপাধিধারীগণ জীবনের একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞান জগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হন নি। বাংলা দেশেও ঐ একই দশা—কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধকরণ; উদ্গীরণ, পরীক্ষা পাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর মা·সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম আলেকম্।

এব্রাহাম লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন্ প্রভৃতির নাম শুনেন নি এমন গ্রাজুয়েট অনেক আছে—আমাদের দেশে। ভূগোল চাই না, ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না—শুধু পাশ ক'রে যাও—ম্যাট্রিক, আই, এ, বি, এ; ফাষ্ট ক্লাশ সরেশ এম্ এ। উচ্চ শিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাটসিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারিবল্ডীকেও হয়ত মস্ত একটি বীর বলে জানেন, কিন্তু কাবুলের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুলকাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকার অন্তর্বিবাদ (civil war) কেন হল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কন, জ্যাকসন্ কে? কোন পক্ষ জয়ী হল? তা হলেই ফিলসফির ফাষ্ট ক্লাশ এম্. এ; একেবারে অবাক হয়ে হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন; —এ সব আবার কি? প্রফেসরের কোন নোটে ত এ সব লাল, নীল, সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিনকালে পাঠ করি নি!

"বক্তৃতা ও প্রবন্ধ"

ভারতে জন্মগত অস্পৃশ্যতা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভারত ব্যতীত জগতের কুত্রাপি বর্ণগত কর্ম্মনির্দেশ বা অস্পৃশতা নাই। চীন দেশে পয়তাল্লিশ কোটি লোকের বাস, সেখানেও এ পাপ নাই। ইংলণ্ডে নাই, আমেরিকায় নাই। ইংরেজ ও আমেরিকান লেখকেরা বলেন বিগত তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত তাহারা খুঁজিয়া পান নাই। সর্বত্র এই দেখি, সকল বর্ণের লোকেই স্ব স্ব ইচ্ছা বা সুযোগ অনুযায়ী সকল কর্ম্মই অবলম্বন করিতে পারে।

কোথাও দেখি না, পুরুষ পরম্পরায় চামার, মেথর বা ধাঙড়েরা অচলায়তনের মত রহিয়াছে। মেথর, চামারের কাজত সব দেশে কেউ

ঘৃণ্য মনে করেই না বরং নগরীর উপকণ্ঠে যে সকল কৃষক আছে তাহারা সার রূপে ব্যবহারার্থ বিষ্টা প্রভৃতি নাগরিকদিগের নিকট যাজ্ঞা করিয়া থাকে। আর ভারতে যে চামার, মুচি বা মেথর জন্মিল সে চির দিনই চামার মেথর রহিয়া গেল।

চামার থেকে রাজ্যে সর্বোচ্চ পদ অধিকার করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু আছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, লয়েড্ জর্জের বাপ যখন মারা যান, তখন তাঁর সবে তিন বৎসর। তাঁকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন তাঁর মামা। এই মামাই একজন চর্মকার।

রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক স্টালিনের পিতা ছিলেন একজন মুচি—চামারও নয়। বাল্যকালে স্টালিন জুতা সেলাই করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতেন।

কোটিপতি মিঃ বাটাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এক মুচিগৃহে। তিনি অল্প দিন হইল মারা গিয়াছেন। আজ তাঁর ছেলে দশখানি এরোপ্লেনের মালিক—তাই চাপিয়া তিনি সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ান।

তারপর জীবাণু বিজ্ঞানের যিনি পত্তন করেন, সেই পাস্তর জন্মেছিলেন এক চর্ম পরিষ্কারকের কুটীরে।

রবার্ট, ডিউক অব নর্মাণ্ডি বিবাহ করিয়াছিলেন এক চর্মকারের কন্যাকে আর তাঁহারই গর্ভে জন্মেছিলেন—উইলিয়ম দি কঙ্কারার।

মিশনারী উলিয়ম কেরী সাহেব—যাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তক—বাল্যকালে মুচির কাজ করিতেন।

কি ইংলণ্ড কি আমেরিকা—সর্বত্র এই রূপ সমাজের সব স্তরের লোক ইচ্ছানুসারে বৃত্তি করিয়া কালে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

দিল্লীর "গণপরিষদে" অস্পৃশ্যতা বর্জনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যিনি অপরকে অস্পৃশ্য বলিবেন, ব্যবহার করিবেন তাহা অপরাধ (criminal) বলিয়া ধরা হইবে।

একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতে। এই পাপ দূর করিতে আমাদিগকে সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। "প্রবন্ধ ও বক্তৃতা"

জাপানে একতা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিগত শতাব্দীর সত্তরের কোঠা আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় জাপানের সামুরাই জাতি সমস্ত সুবিধা এক চেটিয়া করে রেখেছিল। সামুরাই জাপান জাতির মস্তক স্বরূপ, আমাদের দেশের যেমন ব্রাহ্মণ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যে দিন কমোডোর পেরী জাপানের তীরে এসে কামান পেতে অবাধ বাণিজ্যের দাবী করে বসল, সে দিন জাপানের চোখ ফুটল—জাপানীরা অবশ্য তীর ধনুক নিয়ে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানের Feudal system এর অবসান হল—অভিজাত সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় সমস্ত প্রভুত্ব সম্রাটের পদতলে বিসর্জন দিলেন। সামুরাই—আমাদের যেমন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য—সমস্ত অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান তুলে দিলেন। জাতি পরস্পর সহানুভূতিতে এক হ'তে পারল। "এতা" ও "হিনিন" নামে দুইটি জাতি অস্পৃশ্য এবং অতি ঘৃণিত ব'লে বিবেচিত হ'ত—আমাদের দেশের হাড়ি, ডোম, চামার প্রভৃতি হীন অনুন্নত ইতর শ্রেণীর সামিল—গ্রামের বাইরে তাদের বাস করতে হ'ত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর জাপানের ইতিহাসে চির স্মরণীয়, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কারণ ঐ দিন অভিজাত-দর্পে গঠিত সামুরাইগণ নিজেদের দেশভক্তি ও উন্নত হৃদয়ের প্রভাবে স্বেচ্ছায় আপনাদের সর্ববিধ বিশেষ সুবিধা ত্যাগ করলেন—'এতা' ও 'হিনিন' সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন্ ক'রে বল্লেন—"আজ থেকে সমস্ত জাপান এক—আমরা সব ভাই ভাই"। "বক্তৃতা ও প্রবন্ধ"

ডাঃ মেঘনাদ সাহার কৃতিত্ব

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমার এক জন ছাত্র আছে, যার অসামান্য কৃতিত্বের জন্ত আমি আজ গর্বভরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি—মেঘনাদ সাহার নাম আজ জগৎবিখ্যাত—Saha's Law'র কথা সকলেই জানে—কোথায় দুর্নিরীক্ষ নক্ষত্র, কি উপাদানে তা গঠিত, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা যাহা যুগ যুগান্তর ধরে নির্ণয় করে উঠ্‌তে পারেন নি, আজ—Saha's Equation, সেই সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভাবুন দেখি, জাতিটা আজ কত বড় হ'ত, যদি ছয় কোটি লোকের ভিতর সমান মস্তিষ্ক চালনা হত। প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁর New Freedom নামক পুস্তকের এক স্থানে আমেরিকার বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে দেশের রাস্তার মুটে, মজুর, কাল রাষ্ট্রনায়ক—প্রেসিডেণ্ট হবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। ওরা শ্রমের মর্যাদা বোঝে—কৃষক, শ্রমজীবী, খানসামা, মুটে, মজুর, শীতকালে কলেজে পড়ে—রক্‌ফেলার মত কোটিপতির ছেলের সাথে এক সঙ্গে একত্র পড়ছে—এক মেসে থাকে, কেউ কাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবার যো নাই—যদি করে, সকলে তা'কে ill-bred—অভদ্র বলে বিতাড়িত করে দেয়।

বক্তৃতা ও প্রবন্ধ

আজ দেশই আমাদের এক মাত্র আরাধ্য দেবতা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আজ দেশই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। তাঁর পূজার নৈবেদ্য সকলকেই সাজিয়ে আনতে হবে। কারও মুখ চেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে রাজার পুকুরে দুধ ঢালবার মত দুধ আর এসে পৌঁছবে

না—আসবে শুধু জল। তাই আজ মনের ভক্তি ও দেহের শক্তি দিয়ে মায়ের সিংহাসন সাজিয়ে দিতে হবে। এ পূজায় সবারই সমান অধিকার। সকলকেই এ পূজার উপকরণ জোগার করে আনতে হবে। হিন্দু-মুসলমান হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়ে সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবে।

কবিগুরুর প্রতি ভক্তি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক)

১৩৩৮ সনের পৌষে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সম্বর্দ্ধনা পরিষদের পক্ষ থেকে কবিকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, শ্রীযুত অমল হোমের (কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক) আমন্ত্রনে তা রচনা করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মানপত্র খানি নিম্নে দেওয়া হইল।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি, জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তি উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগনস্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক না ইহার নির্মানকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে

পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভ দিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি।

শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের চিঠি

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

২৮শে পৌষ, ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে ভাবছি তোমাকে লিখব, কিন্তু শরীরে দেয়নি। আমি চিরকাল ঘুমকাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে জানি নে,—আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করি নি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুসী হয়ে এসেছি। সে তোমরা টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে, আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়,—আমার মানপত্র কবির হাতে দিলে বলে নয়,—যে ভাবে এই বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হোলো, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায় শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবি সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও

তেমনি সত্যি যে আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে কেউ বেশি মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশিবার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস, তাঁর 'চোখের বালি', তাঁর 'গোরা', তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বল্‌লে কি না বল্‌লে, মান্‌লে কি না মান্‌লে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি! মস্ত কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভরে তোমাকে আশীর্বাদ করি।

শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী করে কলকাতায় বাড়ী তুল্‌ছ, গাড়ী হাঁকাচ্চ! তোমার আমার বন্ধুরাই একথা পরম উৎসাহে প্রচার করছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি, স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডীমাত্র তুমি, পেছন থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন। এ যে বাংলা দেশ, অমল। 'সোনার বাংলা'। তবু বল্‌তে হবে—"আমি তোমায় ভালবাসি।"

মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না-যে যা বলে বলুক, আমি জানি তোমার বাড়ী হয় নি, গাড়ীও হয়নি-যে গাড়ী চড়ে বেড়াও সে বুঝি কর্পোরেশনের। বাস্, ঐ পর্যন্ত। তা না হোক—তোমার ভাল হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

তোমার শরৎ দা

'দেশ'

(পূজা বার্ষিকী)

১৩৫৫

সমাজ ও সংস্কৃতি

শ্রীযুত সুনীল পাল

(ভাস্কর)

(স্পষ্ট বক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি।)

জীবন-মথিত যে অমৃত আজ ভারতবর্ষে উৎসারিত হইতে চাহে, তাহা বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়।

বিংশ শতাব্দীর এই হিংসায় ও বঞ্চনায় সৃষ্ট মানুষের সুসভ্যতার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইবার সন্ধিক্ষণে জীবন ও সংস্কৃতিকে সুসংবদ্ধ করিবার যে মন্ত্র একদা ভারতবর্ষ উচ্চারণ করিয়াছিল, মনপ্রাণ দিয়া একবার তাহাকে উপলব্ধি করি, তাহাকে বরণ করিয়া লই। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, গড়িতে গড়িতে সমাজকে সচ্ছল করিতে করিতে জীবনের যে কোন দিক দিয়া যাহা কিছু ফুটিয়া উঠিবে, তাহার প্রসাদ ও সৌরভ আজ বহুজন সুখায়, বহু-জন হিতায়।

কিন্তু আত্ম-সংস্কৃতির যে স্তরে উন্নীত হইলে মানুষ অপর সাধারণের সুখ ও হিতকে এমন আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, আমরা সেই লাভ ও লোভহীন শিক্ষার উপযুক্ত হইয়াছি কি? সর্বসাধারণের জন্য যে আকুলতা, ইহা নিজেকে বিলাইবার আকুলতা। প্রেম দ্বারা সকল মানুষকে নিজেব মধ্যে গ্রহণ করিতে ও ত্যাগের দ্বারা নিজেকে সকলের মধ্যে উৎসর্গ করিতে না পারিলে এত বড় আদর্শকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রবিধিব শাসনে সফল করিয়া তোলা সহজ নহে। বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়—ইহা ত্যাগের ও প্রেমের বাণী। ইহাই ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ভোটের প্রয়োজনে তুচ্ছতম মানুষকে আজ গায়ে পড়িয়া ভাই—ভাই রবে বিমুগ্ধ করিতেছি; গণশক্তি করায়ত্ত করিবার এ কৌশলকে মানবতার ব্যাখ্যা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বিনিময়ে দুই মুষ্টি

অন্নের প্রতিশ্রুতি দিয়া মনে করিতেছি, প্রতিদান করিলাম, নিরন্নের হাহাকার ঘুচাইয়া তাহাদের কৃতজ্ঞচিত্তের আশীর্বাদ পাইলাম। এ দাক্ষিণ্যে মানুষ পেটে খাইয়া বাঁচিতে পারে, কিন্তু এত সামান্য লইয়া সমাজ বাঁচিবে না। অন্ন দানের সহিত প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্মান দান করিতে হইবে। অন্নের ভাগ, সেই সঙ্গে সুখ ও দুঃখের ভাগ ও আনন্দের ভাগ যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারিব, তখনই সমাজ রক্ষা পাইবে। আজ শুধু লোক ডাকিয়া দল বাঁধিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছি, সমাজ রক্ষা নহে।

স্বরাজ্য গড়িয়া তুলিবার বীজ নিহিত রহিয়াছে আমাদেরই সমাজের অভ্যন্তরে। কিন্তু সমাজ—জীবন আজ বিচ্ছিন্ন, কেহ কাহারও আপন নহে। মানুষের শ্রম অর্দ্ধমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপকার পরিশোধ করিতেছি। আমরা কাজ লইতেছি, মানুষটিকে লইতেছি না। কেবল স্বার্থ লইয়া যে সংস্রব গড়িয়া উঠে, কাজ ফুরাইলে তাহা টিকিয়া থাকে না। কাজের দাম দিয়া দেনা-পাওনাই চলিতেছে, কাজের মান দিয়া সম্বন্ধ পাতাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

ধোপা-নাপিত, কামার-কুমার, মজুর-চাষী প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রমিকের সাহায্য লইয়া তবে মানুষের সুখ—সুবিধা ও সমাজ গড়িয়া উঠে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা আর সতর্ক নহি, অবজ্ঞা ও অবহেলায় তাহাদের দূরে রাখিয়াছি। অথচ এই সকল অপাংক্তেয়দের লইয়াই রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র মতবাদ গড়িয়া তুলিয়া হৃদয়ের ঔদার্য দেখাইতেছি। ইহা ছলনা মাত্র। শিক্ষিত ও উন্নতদের তাড়নায় সমাজেই আজ যাহাদের আসন দিই না, তাহাদের জন্য রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিলেই কি তাহারা সুখে ও সম্মানে থাকিবে?

আজ আমাদের শিক্ষাচারের সহিত, আমাদের উন্নতির সহিত

সংস্কৃতির আর যোগ নাই। নিজের সহিত সকলকে ও সকলের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া দেখিবার নীতিশিক্ষা এবং সংস্কৃতি না পাইলে রাজনীতির যে কোন ইজ্‌ম্‌ই প্রহসনে পরিণত হইবে। একদা রাজারও নীতি ছিল প্রজারঞ্জন। প্রজাসকল সুখে থাকিবে—এ আদর্শও যথেষ্ট মহান ছিল। কিন্তু প্রকৃত নীতিবোধের অভাবে এ রাজনীতি দেশে দেশে ভাঙিয়া পড়িতেছে, এবং আজও ডেমোক্রেসির সংখ্যা গুরুত্বের একান্নজনের চাপে উনপঞ্চাশ জনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত হইতেছে।

আমাদের স্বদেশ—এই বৃহৎ ভারতবর্ষ আজ মন-মরা। বিবাদ—বিচ্ছেদ ও কুসংস্কারের বিষ সমাজের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এ বিসম্বাদ কেবল অন্ন বস্ত্রের জন্য হইলে এত ভয়ঙ্কর হইত না; অন্ন বস্ত্রের সূত্র ধরিয়া ইহার সর্বনাশ মনুষ্যত্বের সমস্ত দিকগুলি আক্রমণ করিতেছে। যুগে যুগে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক হিংসায় ও স্বার্থে কুটিল আকার যে ধারণ করে নাই এমন নহে, কিন্তু সে বিরোধ কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-না-কোন্ একটি বিষয় লইয়া। তাহা আজিকার ন্যায় জীবনের প্রতিটি বিষয় লইয়া প্রত্যেকটি মানুষের আত্মকলহের নিগ্রহ সংক্রামিত ছিল না।

সৌন্দর্য চর্চার বিলুপ্তি ঘটায় শুভ অশুভ মিলিত আমাদের সংসার হইতে মানুষের মঙ্গল অংশটুকু চিনিয়া লইতে না পারায় অকল্যাণের মুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না। জীবনধারণের প্রণালীকে চর্চা দ্বারা অর্জন করিতে হয়। আজ যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারায় পর্যুদস্ত, তাহা আমাদেরই উদাসীনতার অভিশাপ। নিজের চেষ্টায় ও সতর্কতায় গৃহের অঙ্গন ও বাহির উদ্যানে রূপান্তর না করিয়া যদি চারিপার্শ্বে আবর্জনা স্তূপীকৃত রাখিয়া আস্তাকুড় রচনা করি, স্বহস্তে বেষ্টিত সে দুর্ভোগ নিজেদেরই যন্ত্রণার কারণ হইবে। দার্শনিক তত্ত্বকথা উচ্চারণ করিলেই ভবযন্ত্রণার নিরসন হইবে না।

বস্তুরাশির মধ্যে বসবাস করিয়া ব্যবহারের বাস্তব বস্তুগুলিকে সুন্দর ও মনোরম করিয়া সৃজন করিতে না পারিলে কিসের ঐশ্বর্যে আমাদের পরিবেশ সুন্দর হইবে? যাহা সুন্দর নহে তাহা মনকে আকৃষ্ট করে না, তাহা শুধু কাজ সারা। আমাদের জীবন—পালন আজ দায়সারা, ইহার কোন আকর্ষণ নাই। অথচ শিল্পকে এক কালে আমরা ফেলাছড়া করিয়া ভোগ করিয়াছিলাম। ঘর দ্বার, পোষাক পরিচ্ছদ, তৈজষ পত্র—ব্যবহারের যাবতীয় বস্তুকেই শিল্পমণ্ডিত করিয়া সুন্দর করিয়া লইতাম। প্রাণের নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় ইহা অগোচরে জীবন সেই সঙ্গে উজ্জীবিত রাখিয়াছিল। ব্যবহারের সামান্য বস্তুকেও অবজ্ঞা না করিয়া মূল্য হীনকে সোনা করিয়া লইবার যে শিক্ষা, তাহা শ্রম ও সময়ের অপচয় নহে, ইহা মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয়।

কিন্তু মানুষের আত্মোৎকর্ষ ও সংস্কৃতির যাত্রাপথ অন্নবস্ত্রের সমস্যায় আজ পঙ্কিল। গ্রাসাচ্ছাদনের মান এমনই নিম্নস্তরে অবনত হইয়াছে যে অন্ন বস্ত্রের সঙ্কট মানুষকেই গ্রাস করিতেছে। অন্ন বস্ত্রের ভিত্তিতে জীবনকে সুদৃঢ় করিতে না পারিলে সংস্কৃতি ললিত সুষমাকে ধারণ করিতে পারা সম্ভব নহে।

খাওয়া-পরার চাহিদা মিটাইতে রাষ্ট্রকে সজাগ হইতে হইবে। এই কার্যে এবং দেশের অন্যবিধ উন্নতিসাধনে ভারতবর্ষে আজ বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র যন্ত্রের উন্নতি চর্চায় ইউরোপ—আমেরিকায় যে তৎপরতার সাড়া জাগিয়াছে, তাহাতে মনুষ্যত্বের সম্মান নাই। এই দৃষ্টান্তে সতর্ক রহিয়া আজ ইহার ব্যবহারকে সংযত করিতে না পারিলে যন্ত্রের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যন্ত্রশিল্পের সহিত শিল্পকলার প্রসার যদি সমতালে অগ্রসর না হয়, সৌন্দর্য অভাবে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হইবে, যান্ত্রিক উন্নতির মদমত্ততায়

ভারতবর্ষেও দানবের তাণ্ডব চলিবে। যন্ত্র আমাদের যে স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বহন করিয়া আনিবে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ম সীমাজ্ঞান —সে কারণ কলাবোধের প্রয়োজন। কেবলমাত্র উন্নতি আমাদের সভ্যতার কাম্য নহে, বাহিরের প্রাচুর্যের সহিত অন্তরের যে প্রসারতা তাহাই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি। কল-কারখানায় হাত লাগাইবার পূর্বে শিল্প কলার জন্ম, বিশেষ করিয়া কুটির শিল্প বা হাতের কাজগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত অবহিত হইতে হইবে, নতুবা যন্ত্রের শব্দে জীবনের সঙ্গীত নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যাইবে।

আজ নিরাপত্তার অভাবে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় কল্যকার জন্ম আমরা সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করিতেছি। সঞ্চয়ের নেশায় মানুষে মানুষে স্বভাবতই ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়া বঞ্চনার ও বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভে সমাজকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষ আজিকার সভ্যতার ন্যায় মানুষকে লোভে ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে নাই।

রাষ্ট্রের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় উৎপাদন পর্যাপ্ত হইলে, সকল মানুষ মোটা ভাত—কাপড়ের নির্ভরতা পাইলে, সাধারণের মুখের গ্রাস হরণ করিয়া কাহারও ধনী হইবার বাসনা ও উপায় থাকিবে না। সাধারণ আর ধনিকের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকিবে না। অন্নবস্ত্রের পরিমিত প্রয়োজন মিটাইয়া জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলে মানুষের সহিত মানুষের সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। সম্পর্কহীন সমাজ লইয়া শিল্প ও সংস্কৃতির সম্ভাবনা স্বপ্ন মাত্র।

"শনিবারের চিঠি"

বন্ধুর সহিত তাঁহার আলাপ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

(দেশ প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, এবং কবি। বাড়ী-ঢাকা "দেশবন্ধু" সমস্ত বঙ্গদেশের দান)

এক দিন দেশবন্ধু তাঁহার একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন:— "দেখ, প্র্যাক্‌টিস্ করতে গেলে দেশের কাজ করা চলেনা। এ বছর পাঁচলাখ টাকা রোজগার করলাম, কিন্তু একটা পয়সাও থাকেনা, দেশের কাজ তেমন কিছুই করতে পারলাম না। আমার কতগুলো দেনা রয়েছে ঐ গুলো শোধ হয়ে গেলেই ব্যবসা ছেড়ে সম্পূর্ণ ভাবে দেশের কাজে লাগ্‌বো। কিন্তু বছরের পর বছর যাচ্ছে ঋণ আমার বেড়েই চলেছে। নিজের জন্য ভাবিনা—কষ্ট কি, প্রথমে জীবনে দেখেছি। ট্রামের ভাড়া বাঁচবার জন্য হাইকোর্ট থেকে বিকেলে ফেরবার সময় হেঁটে এসেছি এবং এমন দিন গেছে যে দিন হয়তো দুই আনা বই পরিবারের সম্বল ছিল না। আর যদি দশ বছরই বাঁচি, প্র্যাকটিস্ ছাড়লেও এক রকম করে সুখে দুঃখে যাবে, কিন্তু একটা কেবল ভাবনা হয়, অনেকগুলো লোক আমার কাছে মাসিক সাহায্য পায়; সে বেচারাদের কি হবে, যাই হোক, এত না ভেবে ঝাঁপিয়ে না পড়লে হবে না। তোমরা এই সম্বন্ধে কি বল?'

আমরা উত্তর করলাম, অনন্যকর্মা হয়ে দেশ সেবায় না লাগ্‌লে দেশের বিশেষ কিছু করা যাবে না। আমার যত দুর মনে আছে, তিনি সবশুদ্ধ ষোল লক্ষ টাকার ব্রিফ্ ফেরত দিয়াছিলেন—প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িবার সময়। শুধু দেশের কাজে অবসর করতে তিনি টাকার দিক দিয়া কি বিশাল ত্যাগই না করিয়াছিলেন! তিনি ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দুধ খেতেন্ না, সুকোমল শয্যায় শুইতেন না—জিজ্ঞাসা করিলে

বলতেন—যাহাদের দুধ যোগাতুম, তাহারা দুধ না খেয়ে মরুক, আর আমি দুধ খাব ?"

হেমন্তকুমার সরকার এম্‌, এ ;
দেশবন্ধুর জীবনী"

দেশবন্ধুর পিতৃ ঋণ পঁচাত্তর হাজার টাকা শোধ—কোন দাবী না থাকাতেও।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ ; বি এল্‌।
(অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা)

১৯১৬ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক জীবনে আমি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ছিলাম। অত্যন্ত নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এমন অসামান্য একাগ্রতা, মক্কেলের কাজকে এমন নিজের কাজ বলিয়া জানা, আর কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মোকর্দ্দমায় মন বসিয়া গেলে তিনি যেন ভূতাবিষ্টের মত খাটিতেন, তা সে টাকা পান কি না পান। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমাই তাঁহার পসারের প্রধান ভিত্তি, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা চালাইবার সময় তাঁহার ধার করিয়া সংসার খরচ চালাইতে হইয়াছিল। অরবিন্দের মোকর্দ্দমার জন্য তিনি আট দিন সওয়াল জবাব করিয়াছিলেন। যাহারা ঐ বক্তৃতা শুনিয়াছিল তাহাদের কাণে এখনও যেন উহা বাজিতেছে। এমন সযুক্তিবদ্ধ অথচ এমন আবেগময় বক্তৃতা ভারতবর্ষের কোনও বিচারালয়ে যে কখনও হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

জীবন সংগ্রামে ভাগ্য পুরুষকারের নিকট পরাজয় মানিতে হইল ; ভাগ্যদেবী স্বহস্তে বিজয়টিকা পড়াইয়া পুরুষসিংহকে—চিত্তরঞ্জনকে

পুরস্কৃত করিলেন। যে টাকার জন্ত পিতাপুত্রকে দেউলিয়া হইতে হইয়াছিল, সেই পরিমাণ অর্থ চিত্তরঞ্জন সঞ্চয় করিয়া দায়মুক্ত হইলেন। এই দেনাদারের প্রতি তখনকার হাইকোর্টের জজ ফ্লেচার সাহেবের উক্তিটি পৃথিবীর লোকের গর্বের বস্তু হইয়া আছে। জষ্টিস্ ফ্লেচার সাহেব বলিয়াছিলেন,—"দেউলিয়া আসামী দেনাশোধের কোন চাপ না থাকিলেও যে এমন করিয়া স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পাওনাদারের টাকা মিটাইয়া দেয়, তাহা আজ পৃথিবীর আদালতে নজীর, ইহাই প্রথম লিপিবদ্ধ হইল।"

"দেশবন্ধুর জীবনী"

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ;
(ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, রিপন কলেজ, কলিকাতা)

রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক কাহিনীর দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কীর্তনে প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোন রূপে অধিকার আছে কিনা এ বিষয় ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণ সেন ঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তি অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে

পারে ; কিন্তু পলাশির লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাক্যত, কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয় তাহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্ম গৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয় আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্র স্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ এক খানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন। এই চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখনও নোয়াইতে পারে নাই। সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই ; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল ; বঙ্গদেশে তাঁহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা বিবাহে পথ প্রদর্শন তাহার জীবনের সর্ব প্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধার রূপে তিনি লোক সমাজে প্রতীয়মান হন। বিদ্যাসাগর

[illegible] জাগিয়াছিল তখন [illegible] হয় নাই যে সেই [illegible] পথে [illegible] পারে। কুলাচারের প্রবল বাধা তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটী ভঙ্গিতে তাঁহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এই খানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন।

"চরিত কথা"

নেতাজীর ছবি

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মকাহিনী "ভারতপথিকের" প্রকাশক সিগ্‌নেট প্রেস নিম্নলিখিত রূপ চিত্র আঁকিয়াছেন নেতাজীর :—

"বাংলার বীরকুলের শিরোভূষণ সুভাষচন্দ্র। ত্যাগে, কর্মে, চরিত্রে, পৌরুষে, স্বপ্নে ও সংগঠনে সুভাষচন্দ্র একেশ্বর সূর্য। নিষ্কাশিত তলোয়ারের মতো তিনি উদার ও উজ্জ্বল, অভ্রংলিহ আগুনের মতো তিনি দীপ্যমান।

দিল্লী চলো! ভেদবিভেদের ক্ষুদ্রতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতকে ডাক দিলেন সুভাষচন্দ্র, একমন্ত্রে বাঁধলেন বাঙ্গালী,—আসামী—মারাঠা—পাঞ্জাবী—মাদ্রাজী—রাজপুত—শিখ হিন্দু আর মুসলমানকে। পর্বত—সমুদ্র পেরিয়ে, সমগ্র দুর্গমতাকে অতিক্রম করে, আজাদ হিন্দ ফৌজের দুর্জয় রথ ঘর্ঘরিত হল, ভারতের সীমানায় সীমানায়। স্বাধীন ভারতের সেই প্রথম পতাকা, ভারতের আকাশে সেই প্রথম মুক্তির অরুণোদয়।

সুভাষচন্দ্রকে সত্য মূল্য দেবে ভবিষ্যতের ইতিহাস, আজকের বিষ-বিকৃত বর্তমান নয়। খণ্ডিত ভারতের সমস্ত কলহকলঙ্কের উর্দ্ধে

বিরজিদাস্‌ সেই যে একেবারে সুপ্ত, তাঁকে আবার আমরা দেখব।

আমাদের ঘুমন্ত রক্তে আবার তাঁর আবির্ভাব হবে। শুভলগ্নে একদিন শোনা যাবে তাঁর তূর্যনিনাদ। সমস্ত ভারত আবার প্লাবিত হবে এক নতুন অনুপ্রেরণায়।”

সাম্যের বাণী

মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ

মহাত্মা গান্ধী এক সময় বলিয়াছিলেন:—“যদি আমি আমার পশ্চাতে জাতির সাধারণকে সমবেত পাই, নগণ্য উচ্চ শ্রেণীর জাতি-বিধ্বংসীকর প্রভুত্বকে আমি স্ফুলিঙ্গের মত উড়াইয়া দিতে পারি।”

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন:—“একদিন আসিবে যে দিন এরা (দেশের সাধারণ লোক) আভিজাত্যকে গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত হইবে।”

মহাত্মা গান্ধীর জীবনী

ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু

আপনারা সকলে জানেন, ব্রিটিশ যখন ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিল, তখন ভারত এমন একটা দেশ ছিল, যেখানে গ্রাসাচ্ছাদন ছিল সচ্ছল। ভারতের ঐশ্বর্যই সমুদ্রের ওপারের দারিদ্র্যপীড়িত ইংরাজদের প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রাজনৈতিক দাসত্ব ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতের জনগণ ক্ষুধায় ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। আর যে ব্রিটিশ

জাতি একদিন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিল, আজ তাহারা ভারতের ধন সমৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখ ও দুর্ভোগ, হীনতা ও নিপীড়নের ভিতর দিয়া ভারতের জনগণ শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে, তাহাদের বহু রকমের সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে তাহাদের হাতে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারসাধন।

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত বিজয়ের উপায়গুলির কথা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রিটিশ ভারতের কোন অংশের সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হয় নাই—তাহারা একেবারে সমগ্র ভারত বিজয় এবং অধিকার করিতে চেষ্টাও করে নাই। পক্ষান্তরে তাহারা এদেশে সামরিক কার্যকলাপ আরম্ভ করাব আগে সর্বদাই উৎকোচ ও দুর্নীতির সাহায্যে এক শ্রেণীর লোককে করায়ত্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলাতেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এখানে প্রধান সেনাপতি মিরজাফরকে বাঙ্গলার সিংহাসন অর্পণ করিয়া তাহাকে বশীভূত করা হইয়াছিল। সে সময়ে ধর্মগত বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও প্রশ্ন কাহারও নিকট উঠে নাই। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলা মুসলমান ছিলেন, তাঁহার প্রধান সেনাপতি মুসলমান হইয়াও তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং হিন্দু সেনাপতি মোহনলালই শেষ পর্যন্ত সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসের এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, বিশ্বাসঘাতকতা রোধ করিতে এবং তাহার শাস্তি বিধান করিতে যদি যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে কোন জাতিই স্বাধীনতা রক্ষা করার আশা করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলার এই ঘটনাচক্র যথাসময়ে ভারতীয় জনগণের চোখ ফুটাইয়া দিতে পারে নাই। এমনকি সিরাজদ্দৌলার পতনের পরেও যদি ভারতের জনগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে

সঙ্ঘবদ্ধ হইত তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই এই অবাঞ্ছিত বিদেশীদের ভারতের বুক হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত।

একথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, ভারতের জনগণ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে নাই। কিন্তু তাহারা সকলে মিলিত হইয়া একতাবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করে নাই। যখন ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করিল তখন কেহই তাহাদের পিছন দিক হইতে আক্রমণ করে নাই। পরে যখন ব্রিটিশ দক্ষিণ ভারতে টিপুসুলতানের সঙ্গে যুদ্ধরত হইল তখন মধ্য ভারতের মারাঠারা, অথবা উত্তর ভারতের শিখেরা—কেহই টিপু সুলতানের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয় নাই। এমন কি বাঙলার পতনের পরেও দক্ষিণ ভারতের টিপু সুলতান, মধ্য ভারতের মারাঠাগণ ও উত্তর ভারতের শিখগণ সম্মিলিত হইলে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাহা হয় নাই। সুতরাং এক এক সময়ে ভারতের এক এক অংশ আক্রমণ করা এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই বেদনাময় অধ্যায় হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, যদি শত্রুর সম্মুখে ভারতবাসিগণ সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান না হন, তবে তাঁহারা কখনও স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবেন না, এমন কি স্বাধীনতা অর্জন করিলেও তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

ভারতীয় জনগণের চোখ খুলিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ভারতের নানা অংশে তাহারা একযোগে ব্রিটিশকে আক্রমণ করিল। সংগ্রাম আরম্ভ হইলে প্রথমে ইংরাজ অনায়াসেই পরাজিত হইল। এই সংগ্রামকে ইংরাজ ঐতিহাসিকরা "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করিলেও আমরা জানি ইহা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু দুইটি কারণে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরাজয় ঘটে। ভারতের সমস্ত অংশ এই সংগ্রামে যোগদান করে নাই এবং

আরও একটি কারণ আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষদের সামরিক দক্ষতা শত্রুর সেনাবাহিনীর অধিনায়ক অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ছিল।

একথা সত্য যে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ইউরোপ যুদ্ধবিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করিলেও ভারতবাসিগণ তখন সময়ের তালে পা ফেলিয়া চলেন নাই—তাই সংগ্রামের চরম মুহূর্তে উপযুক্ত ভারতীয় সৈন্যাধক্ষের অভাব দেখা দিয়াছিল। ১৮৫৭ সালের ব্যর্থতা হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, ভবিষ্যতে ভারতীয়গণকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সর্ববিষয়ে উন্নতির সংস্পর্শে আসিতে হইবে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধবিজ্ঞানের।

*১৮৫৭ সালের পরাজয়ের পর ভারতীয়গণ ব্রিটিশ কর্তৃক নিরস্ত্র হইল। সেদিন অস্ত্র সমর্পণ করা ভারতবাসীর মারাত্মক ভুল হইয়াছে। যদি ভারতীয় জনগণ নিরস্ত্র না হইত যাহার ফলে ভারতবাসী আজ অসহায়, তাহা হইলে ইতিমধ্যে হয়ত আর একবার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আঘাত হানিবার সুযোগ মিলিত। যাহাই হোক, প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল ভারতবাসিগণ সাময়িকভাবে হতাশ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

অবশেষে ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসভার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জনগণ নূতন আশার আলোকের সন্ধান পাইল। জাতীয় মহাসভার নেতৃবৃন্দ প্রথমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিতে ও ইংরেজের সহিত সকল সংস্রব চুকাইয়া দিতে ভয় করিয়াছিল। কিন্তু বিশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই জাতীয় মহাসভায় নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। ১৯০৫ সালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ন্যায় নায়কগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতে দেখা গেল। পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়গণকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চরম উপায়ও গ্রহণ করিতে দেখা গেল। ব্রিটিশের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের উপযুক্ত প্রতিদান স্বরূপ, বঙ্গদেশে

ব্রিটিশ দ্রব্যসমূহের বয়কট আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই বয়কট সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বয়কটে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া ভারতীয় যুবকগণ বোমা ও রিভলবার ধরিল। ভারতের বাহিরে, প্যারিসে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে কতিপয় যুবক প্রেরিত হইল বৈপ্লবিক ও ধ্বংসমূলক কার্যসমূহ শিক্ষা করিতে আর ভারতে অবস্থিত যুবকগণ পৃথিবীর অপর প্রান্তে বিশেষতঃ রাশিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডে যে বৈপ্লবিক পন্থা অনুসৃত হইয়াছিল তাহার অনুশীলন করিতে লাগিল।

বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভণ্ড ব্রিটিশ রাজনৈতিক দ্বারা মিথ্যা অঙ্গীকারের ছলনায় অতি সহজেই প্রতারিত হইয়াছিল। ফলে ভারতবাসীর পরাধীনতার নাগপাশ অধিকতর দৃঢ় করিতে ভারতের রক্ত এবং অর্থ ব্রিটিশের জন্য নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবিগণ তাঁহাদের আত্মমর্যাদা চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহারা ব্রিটেনের ছলনায় প্রতারিত হন নাই। তাঁহারা দেশের মধ্যে বিপ্লবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা ব্যর্থ হয়।

গত মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিলে যখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটেনের অঙ্গীকৃত স্বাধীনতার দাবী করিল, তখন প্রথম বারের মত তাহারা ইংরাজ জনগণ কর্তৃক ও ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে। তাহাদের দাবীর প্রত্যুত্তরে আসিল ১৯১৯ সালের "রাওলাত অ্যাক্ট" বা "ব্ল্যাক অ্যাক্ট"। ফলে ভারতীয়গণের নিকট যে সামান্য ক্ষমতাটুকুও ছিল তাহাও হস্তান্তরিত হইল এবং তাহারা ঐ "ব্ল্যাক অ্যাক্টের" প্রতিবাদ করিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। ব্রিটেনের পক্ষে থাকিয়া সকল উৎসর্গ ও সহায়তার যোগ্য প্রতিদান স্বরূপ ভারতীয়গণ লাভ করিল "রাওলাত অ্যাক্ট" ও

"জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।"

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার পর ভারতের জনগণ হতবুদ্ধি ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত চেষ্টা ইংরাজ তাহার সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে নির্মমভাবে চূর্ণ করিয়াছিল। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, সশস্ত্র বিপ্লব—সকল উপায়েই স্বাধীনতা অর্জন করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। আশার আর একটি আলোর রশ্মিও অবশিষ্ট ছিল না। হৃদয়ে অবরুদ্ধ রোষ প্রজ্জ্বলিত থাকা সত্বেও ভারতীয় জনগণ নূতন পদ্ধতি-স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন অস্ত্রের সন্ধানে ফিরিতেছিল। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে ১৯২০ সালে দেখা দিলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখমণ্ডল তখন আশা ও বিশ্বাসের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আবার মনে হইল ভারতের জয় সুনিশ্চিত।

১৯২০ সালের পর হইতে ভারতীয় জনগণ মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ছুটি জিনিষ শিক্ষা করিয়াছে, যাহা স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অপরিহার্য। সর্ব প্রথমে তাহারা জাতীয় সম্মান বোধ ও আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা করিয়াছে যাহার ফলে তাহাদের অন্তর এখন বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা দেশব্যাপী এমন একটি প্রতিষ্ঠান লাভ করিয়াছে যাহার প্রভাব ভারতের দূরতম পল্লীতেও যাইয়া পৌঁছে। স্বাধীনতার বাণী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করায় সমগ্র জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহারা লাভ করিয়াছে, ফলে চরম মুক্তিসংগ্রামের স্বাধীনতার জন্য শেষ যুদ্ধের ক্ষেত্র আজ প্রস্তুত।

আজ দেশের ভিতরে যে ভারতীয়গণ আছেন, শেষ সংগ্রামের জন্য তাঁহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের আছে। অভাব আছে, কেবলমাত্র একটি জিনিষের—মুক্তি সেনাদলের। এই মুক্তি সেনাদল,

ভারতের বাহির হইতে পাঠাইতে হইবে; কেবলমাত্র ভারতের বাহির হইতেই উহা পাঠান সম্ভব।

আমি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় জাতির কাছে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা উত্থাপিত করিয়া মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"যদি ভারতের আজ তরবারি থাকিত তাহা হইলে ভারত তরবারি কোষমুক্ত করিত।" যুক্তি দেখাইয়া মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা অবান্তর বলিয়াই দেশবাসীর পক্ষে তাহার পরিবর্তে অপর উপায় হইতেছে অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ। সেদিন হইতে সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতীয় জনগণের পক্ষে এখন তরবারি কোষমুক্ত করা সম্ভবপর। আমরা এজন্য আনন্দিত ও গর্বিত যে ভারতের মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সৈন্যসংখ্যা বর্ধিত হইতেছে। আজ আমাদের সৈন্যদলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তাহাদের যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নূতন সেনাদল গঠন করিয়া রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যাইতে হইবে। স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ দীর্ঘ এবং কঠোর হইবে এবং যে পর্যন্ত ভারতে ইংরাজগণ বন্দী অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত না হয় সে পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে।

[নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বেতার বক্তৃতা : ব্যাঙ্কক, ২।১০।৪৩]

দিল্লী চলো

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সেনাদল, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্ব করিবার দিন। আজ ভগবান আমাকে সমগ্র জগতের কাছে এই

ঘোষণা করিবার অপূর্ব সুযোগ এবং সম্মান দান করিয়াছে যে, ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য সেনাদল গঠিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাকার স্বরূপ ছিল; সেই সিঙ্গাপুরে এই বাহিনী এখন ব্যূহবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই বাহিনী শুধু যে ভারতবর্ষকে বৃটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবে ইহাই নয়, অতঃপর এই সেনাদলকে ভিত্তি করিয়া স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় বাহিনী গঠিত হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই বাহিনীর জন্য গর্ব বোধ করিবে। এ বাহিনী তাহাদের নিজেদের বাহিনী, সমগ্রভাবে ভারতবাসীদের নেতৃত্বে ইহা গঠিত হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক ক্ষণ সমাগত হইলে ভারতীয়দেরই নেতৃত্বে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে।

লোকে একদিন এই বিশ্বাস করিত যে, যে সাম্রাজ্যের মধ্যে সূর্য অস্তমিত হয় না, তাহা বুঝি চিরস্থায়ী হইবে। এইরূপ চিন্তায় কোন দিনই আমি মাথা ঘামাই নাই। ইতিহাসে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতির অধোগতি এবং পতন অনিবার্য। ইহা ছাড়া একদিন যেসব নগর এবং দুর্গ সুরক্ষিত ছিল সেগুলি কিরূপভাবে সাম্রাজ্যের সমাধিভূমিতে পরিণত হইয়াছে, আমি স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমাধির উপর দাঁড়াইয়া যে কোন শিশুও এই সত্য উপলব্ধি করিবে যে, প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই অতীতের বিষয়বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স যখন জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সমরসজ্জা আরম্ভ হয়, তখন জার্মাণ সেনাদের কণ্ঠে শুধু এই এক ধ্বনি উচ্চারিত হইত, প্যারিস চলো, প্যারিস চলো। নিপ্পনের বীর সৈনিকদল ১৯৪১ সালে তাহাদের বিজয় অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাহাদের মুখে এই এক কথাই ছিল—সিঙ্গাপুর চলো, সিঙ্গাপুর চলো।

সতীর্থগণ, সৈনিকগণ, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, ইহাই তোমাদের

রণধ্বনি হউক। আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আমাদের মধ্যে আমরা কতজন জীবিত থাকিব আমি জানি না; কিন্তু আমি ইহা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, চরম জয়লাভ আমরাই করিব এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যেসব বীর জীবিত থাকিবে, তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপর একটি শ্মশানভূমি—প্রাচীন দিল্লীর লাল কিল্লায় তাহাদের বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করিবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য উদ্‌যাপিত হইবে না।

দেশসেবার কর্মক্ষেত্রে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সব সময়ই আমার ইহাই মনে হইয়াছে যে অন্য সব বিষয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু একটি বিষয়ে তাহার অভাব রহিয়াছে অর্থাৎ তাহার স্বাধীনতা প্রয়াসী সেনাদল নাই। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন এই জন্য যে, তাঁহার সেনাদল ছিল। গ্যারিবল্ডী ইটালীকে স্বাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কারণ তাঁহার পিছনে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠনে অগ্রগামী হইবার সুযোগ এবং সম্মান লাভে তোমরা সৌভাগ্যবান হইয়াছ। এতদ্বারা আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে শেষ অন্তরায়কে তোমরা দূর করিয়াছ। এমন মহৎ ব্রতের তোমরাই অগ্রদূত হইয়াছ, পুরোভাগে থাকিয়া তোমরাই চলিয়াছ, এজন্য সুখী হও—গর্ববোধ কর।

আমি তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি, সে কর্তব্য দ্বিবিধ। অস্ত্রবলের সাহায্যে এবং তোমাদের শোণিতোৎসর্গের দ্বারা তোমাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। তারপর ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন স্বাধীন ভারতের জন্য স্থায়ী বাহিনী তোমাদিগকেই গঠন করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা সর্বদা রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য হইবে। তোমাদিগকে আমাদের দেশরক্ষার

শক্তি এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, আমরা যেন আর কোনদিনও আমাদের স্বাধীনতা না হারাই।

সেনা হিসাবে তোমাদিগকে তিনটি আদর্শ সর্বদা অন্তরে উদ্দীপ্ত রাখিতে হইবে এবং জীবনকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিতে হইবে। বিশ্বস্ততা, কর্তব্য পালন এবং ত্যাগ এই তিনটি হইবে তোমাদের আদর্শ। যেসব সৈনিক তাহাদের জাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, যাহারা সর্বাবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কর্তব্য পরিপালনে কখনও পরাঙ্মুখ না হয় এবং যাহারা জীবনদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত, সেই সব সৈন্য অপরাজেয় হইয়া থাকে। তোমরাও যদি সেইরূপ অপরাজেয় হইতে চাও, তোমাদের অন্তরের অন্তরতমদেশে উক্ত আদর্শত্রয় দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখ। প্রকৃত যে যোদ্ধা, তাহার সামরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ শিক্ষালাভের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তোমরা—তোমাদের সকলেই তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের সতীর্থগণকে এরূপভাবে শিক্ষিত করিয়া তোল যে প্রত্যেক সৈনিক যেন অপরিসীম আত্মবিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে। তাহাদের যেন প্রত্যেকের মনে শত্রুদের চেয়ে সে যে অশেষ রকমের শক্তিশালী এই বিশ্বাস জাগরূক থাকে। সে যেন মৃত্যুর সম্বন্ধে নির্ভীক হয় এবং সঙ্কটকালে প্রয়োজন হইলে নিজেই নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার মত যথেষ্ট উদ্যমসম্পন্ন হইতে পারে। বর্তমানের এই যুদ্ধের সময় সাহস, নির্ভীকতা এবং উদ্যমের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত সেনাদল কি অঘটন ঘটাইতে পারে তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা যাহা শিক্ষা করিতে পার শিখিয়া লইবে এবং আমাদের মাতৃভূমির জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বাহিনী গঠন করিবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের সেনানী তাহাদিগকে আমি এই কথা বলিব যে, তোমাদের কর্তব্য অতি গুরুতর। জগতে

প্রত্যেক বাহিনীর সেনানীদের দায়িত্বই গুরুতর; কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে সে গুরুত্ব আরও অনেক বেশী। রাজনীতিকভাবে আমরা পরাধীন, এজন্য অনুপ্রেরণা লাভ করিবার মত আমাদের ইতিহাসে মুকদেন, পোর্ট আর্থার অথবা সিডানের মত কিছু নাই। বৃটিশ আমাদিগকে যেসব শিক্ষা দিয়াছে, তাহার কতকগুলি বিষয় আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং যাহা শিক্ষা দেয় নাই, এমন কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমরা অবস্থার সঙ্গে বুঝিয়া চলিতে পারিবে এবং তোমাদের দেশবাসী তোমাদের সুদৃঢ় স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহা পালন করিবে। সেনাদল গড়িয়া তোল। এখনও স্মরণ রাখ যে, বৃটিশেরা যে এত জায়গায় পরাজিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, তাহাদের সেনানীরা অযোগ্য। ইহাও স্মরণ রাখ যে তোমাদের দল হইতেই স্বাধীন ভারতের ভাবী সেনানায়কদল গঠিত হইবে। তোমাদের সকলকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে এই সংগ্রামকালে তোমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং যে সাফল্য অর্জন করিবে তাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সেনাদলের গৌরববুদ্ধি জাগ্রত হইবে। যে সেনাদলের পক্ষে বীরত্ব, নির্ভীকতা ও অপরাজেয়তার সম্বন্ধে নিজেদের গর্ব করিবার মত অতীত স্মৃতি নাই, কোন পরাক্রান্ত শক্তির সহিত সংগ্রামে তাহারা টি*কিতে পারে না।

সতীর্থগণ, তোমরা স্বেচ্ছায় এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছ। মানবজীবনে এই ব্রত মহত্তম। এই সব ব্রত উদযাপন করিবার পক্ষে কোন ত্যাগ স্বীকারই খুব বেশী নয়, নিজের জীবন পর্যন্তও তুচ্ছ। তোমরাই আজ ভারতের জাতীয় মর্যাদার রক্ষক এবং ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ। এমন ভাবে চল যেন তোমাদের দেশবাসী তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতে পারে এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তোমাদের

জন্য গর্ব বোধ করে।

আজ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গর্বের দিন, এ কথা আমি বলিয়াছি। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সেনা হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান এবং বড় গৌরবের বিষয় অন্য কিছু নাই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে এতদোপযোগী দায়িত্বও রহিয়াছে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে সচেতন।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি আলোক এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ের ক্ষেত্রে আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকিব। বর্তমানে তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখকষ্ট দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ব্যতীত আমার দিবার কিছু নাই। কিন্তু যদি তোমরা জীবনে ও মৃত্যুতে আমার অনুসরণ কর,—আমি জানি, তোমরা তাহাই করিবে, আমি তোমাদিগকে বিজয় এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে লইয়া যাইব। আমাদের মধ্যে কে জীবিত থাকিয়া ভারতকে স্বাধীন দেখিবে ইহা বিবেচ্য নয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট এবং ভারতের সেই স্বাধীনতার জন্য আমাদের সর্বস্ব সমর্পণ করিব।

ভগবান আমাদের সেনাদলকে আশীর্বাদ করুন এবং আসন্ন সংগ্রামে আমাদিগকে বিজয়ী করুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

[১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষণ]

বাংলার সমাজ গঠন—ইংরেজাধিকারের প্রথম ভাগে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজরা ভারত দখল করবার পর দেশের সামাজিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল তার স্বরূপ

কল্পনা করা এ যুগের লোকের পক্ষে মোটেই সহজ নয়, কিন্তু মোটামুটি তার একটি ছবি মনে না থাকলে আজকের দিনে দেশের বুকে চলচ্চিত্রের মতো যে সব পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, তার মূল সূত্রটি ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তন বাঙলাদেশে—সুতরাং বৃটিশ শাসনে দেশের যে পরিবর্তন হয়েছে তারও শুরু বাঙলাদেশেই। দেশীয় শাসনতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সামন্তশক্তির প্রাধান্য একেবারে কমে যায়। এদের স্থান দখল করে নূতন এক সম্প্রদায়। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে, অবস্থার পরিবর্তনে ক্রমে তাদের হাতে এলো রাজদণ্ড। কিন্তু মুষ্টিমেয় একদল ইংরেজের পক্ষে দেশীয় লোকের সহায়তা ছাড়া বাণিজ্য বা রাজ্যশাসন কোনটাই সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় যারা দেশের ভাগ্যবিবর্তনকে মেনে নিয়ে বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার জোরে ইংরেজদের কাছে নিজেদের অপরিহার্য করে তুলেছিল তারাই সমাজে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। এরাই বৃটিশ আমলের অভিজাত সম্প্রদায়।

বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকে বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কোনো ব্যাপারেই অংশ গ্রহণ করে নি। এর কারণ নানা ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। একদল বলেন, বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের যে শাসকদের পরাজিত করে ইংরেজরা এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল তাঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী, তাই মুসলমানেরা ইংরেজ শাসন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। আর একদল বলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার বহু আগে থেকেই মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরেছিল। তাছাড়া প্রথম প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্বন্ধে মুসলমানদের ধর্মগত আপত্তিও ছিল। এর ফলে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে মুসলমানদের প্রাধান্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল। আমি এই দুটি মতের

কোনটাই মানতে রাজি নই, কারণ সারা ভারতে মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে দেশের রাষ্ট্রিয় জীবনে তাদের প্রাধান্য ইংরেজ আমল বা তারও আগে কখনো কমেনি বলেই আমার ধারণা। আজকাল হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের কথা প্রায় প্রচার করা হয় সেটা নেহাৎই কৃত্রিম, অনেকটা আয়র্লাণ্ডে ক্যাথলিক—প্রোটেষ্টান্ট বিভেদের মতো—এবং এর জন্য যে আমাদের বর্তমান শাসকেরাই বহুল পরিমানে দায়ী সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইংরেজরা এদেশে আসবার আগে দেশের শাসনতন্ত্র মুসলমানদের হাতে ছিল বললে সম্পূর্ণটা বলা হয় না, কারণ দিল্লীর মোগল বাদশাহের সময়ই বলুন বা বাঙলার মুসলমান নবাবদের আমলেই বলুন, হিন্দু-মুসলমান পরস্পর সহযোগীতা না করলে শাসনকার্য চালানো কোন মতেই সম্ভব ছিলনা। মোগল বাদশাহ এবং মুসলমান নবাবের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মধ্যে অনেক হিন্দুও ছিল। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারও সম্ভব হইয়াছিল হিন্দু সেনাপতিদের সাহায্যেই। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সিরাজদৌল্লার যে সেনাপতি ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি হিন্দু ছিলেন। আর ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিদ্রোহের নেতা ছিলেন একজন মুসলমান—বাহাদুর শাহ।

যাই হোক, ইংরেজরা ভারত দখল করবার পর বাঙলা দেশের যে কয়-জন মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, যে কারণেই হোক তাঁদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু। এদের মধ্যে রামমোহন রায় ১৭৭২—১৮৩৩) অন্যতম। ১৮২৮ সালে ইনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার সূচনা দেখা যায়। এর মূলে ছিল নবগঠিত ব্রাহ্মসমাজ। এই আন্দোলন অনেকটা রেনেসাঁস ও রেফরমেশন-এর একটি সমন্বয়ের মতো। এক

দিকে এই আন্দোলন দেশের স্বকীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং ধর্মের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল এবং অন্য দিকে, অন্যান্য দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে ভালো জিনিষটুকু গ্রহণ করতেও কম উৎসুক ছিলনা। এই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮—১৯০৫) এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তার ভার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় ব্রাহ্মসমাজই যে দেশের সব রকম প্রগতিশীল আন্দোলনের কর্ণধার ছিল সে কথা সকলেই স্বীকার করবে। প্রথম থেকেই ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব পড়েছিল এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকার যখন স্থির করে উঠতে পারছিলেন না যে এদেশে তাঁরা সম্পূর্ণ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থন করবেন, না পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রচার করবেন, তখন রাজা রামমোহন রায় মুক্তকণ্ঠে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বপক্ষে রায় দেন। তাঁর আদর্শ টমাস ব্যেবিংটন মেকলেকে কত খানি প্রভাবান্বিত করেছিল সেকালের বিখ্যাত মিনিট অব এডুকেশন এ তার পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের আদর্শকেই সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। রামমোহন তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বহুদিন আগেই বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন গ্রহণ না করলে দেশের উন্নতি অসম্ভব।

অবশ্য এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে ব্রাহ্মসমাজেই নিবদ্ধ ছিল তা নয়। যারা ব্রাহ্মদের সমাজদ্রোহী ও ধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন, তাঁরাও স্বদেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমতালে চলবার জন্য ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সম্প্রদায় যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সার

জিনিষগুলি আহরণ করতে ব্যস্ত তখন অধিকতর গোঁড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দু সমাজের মহিমা কীর্তন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন এবং প্রচার করতে লাগলেন হিন্দু সমাজে সবই অভ্রান্ত। এমন কি তাঁরা এও দাবী করলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সব নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে আজ গর্ব করছে সে সবই ভারতের প্রাচীন মুনিঋষির বহুদিন আগেই আবিষ্কার করে গেছেন। এই ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে অত্যন্ত গোড়া সম্প্রদায়ও কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন— শশধর তর্কচূড়ামণির নাম তার মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত। কিন্তু এঁদের রচনায় প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল খৃস্টান মিশনারিদের প্রভাব খর্ব করে হিন্দুধর্মের প্রচার করা। এ ব্যাপারে অবশ্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে গোঁড়া পণ্ডিতদের মতৈক্য ছিল, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কখনও মতের মিল দেখা যায় নি। পুরাতন পন্থীদের সঙ্গে নূতনের, পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের এই সংঘর্ষের ফলে আর একটি নূতন মতের উদ্ভব হয়েছিল। এই নূতন মতের প্রধান সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই মতের সমর্থকেরা প্রগতিপন্থী ছিলেন, এবং তাঁরা দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের সমর্থন করতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারাকে মোটামুটি সমর্থন করলেও এঁরা কখনো হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি হন নি এবং প্রথম যুগের ব্রাহ্মদের মতো পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণকেও সমর্থন করেন নি। গোঁড়া পণ্ডিত রূপে শিক্ষিত হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁর মহানুভবতা এবং সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা তো সর্বজনবিদিত।

এ-ছাড়া আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এত প্রগতিপন্থী হলেও বিদ্যাসাগর

ব্যক্তিগত জীবনে চিরকাল অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পণ্ডিতের মতো অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তুমুল আন্দোলন করে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত। ঈশ্বরচন্দ্র যে মানসিক উদারতা ও মানবহিতৈষণার প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন ধর্মে ও দর্শনে তার প্রকাশ পেয়েছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৪-১৮৮৬) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬০-১৯০২) মধ্যে। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মারা গেলে এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনধারা বহন করবার ভার পড়ল অরবিন্দ ঘোষের উপর। কিন্তু অরবিন্দ রাজনীতি এড়িয়ে চলেন নি, বরং রাজনীতি নিয়ে বিশেষ ভাবেই মেতে উঠেছিলেন, যার ফলে ১৯০৮ সালে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অরবিন্দের মধ্যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। ১৯০৯ সালে অরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক চর্চায় মনোনিবেশ করেন। অরবিন্দের মধ্যে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বয় দেখা গিয়েছিল তার ধারা বহন করতে লাগলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৫-১৯২০) এবং মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)

"ভারত পথিক"

রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রিয় বিপ্লব করা বরং সহজ; কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন।

কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত-নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রনা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে, তাহাদের বিপদ অন্য প্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয় দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোন দিন পায় না। আত্মীয়স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত বিবেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গনে অর্জুনের অবস্থার মত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা কর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শৌখিন হোলেই যে ঐশ্বর্যের উপর মমতা বা লোভ থাকে তা নয়। শৌখিনতা হচ্চে ভিতরের শখ থেকে। কর্তা দাদামশায়ের সেই গল্পই একটি বলি, শোনো। শ'বাজারের রাজবাড়ীতে জলসা হবে—বিরাট আয়োজন। শহরের অর্ধেক লোক জমা হবে সেখানে, যত বড় বড় লোক, রাজরাজড়া সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে।

তখন কর্তাদাদা মশায়দের বিষয় সম্পত্তির অবস্থা খারাপ—ঐ সময়

উনি পিতৃঋণের জন্য সব কিছু ছেড়ে দেন, তার কিছু কাল পরের কথা। শহরময় গুজব রটল, বড় বড় লোকেরা বলতে লাগলেন—দেখা যাক, এবারে উনি কী সাজে আসেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। বাড়ীর কর্মচারীরাও ভাবছে, তাই তো। গুজবটি বোধ হয় কর্তাদাদামশায়ের কানেও এসেছিল। তিনি করমচাঁদ জহুরীকে বৈঠকখানায় ডাকিয়ে আনালেন। করমচাঁদ জহুরী সেকালের খুব পুরোনো জহুরী—এ বাড়ীর পছন্দমাফিক সব অলঙ্কারাদি করে দিত বরাবর। কর্তাদাদামশায় তাঁকে বললেন, এক জোড়া মখ্‌মলের জুতোয় মুক্তো দিয়ে কাজ করে আন্‌তে। তখনকার দিনে মখ্‌মলের জুতো তৈরি করিয়ে আন্‌তে হোত। করমচাঁদ জহুরী তো এক জোড়া মখ্‌মলের জুতো ছোটো ছোটো দানা দানা মুক্তো দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তৈরি করে এনে দিলে। এখন জামা কাপড়—কি রকম সাজ হবে। সরকার, দেওয়ান সবাই ভাবছে, শাল—দোশালা বের করবে, না কিঙ্কের জোব্বা, না কী! কর্তাদাদামশায় হুকুম দিলেন—ও সব কিছু নয়, আমি সাদা কাপড়ে যাব। তখনকার দিনে কাটা কাপড়ে মজলিসে যেতে হোত, ধুতি চাদর চলত না। জলসার দিন কর্তাদাদামশায় সাদা আচ্‌কান্ জোড়া পরলেন, গায় মাথার মোরাসা পাগড়িটি অবধি সাদা, কোথাও জরি—কিংখাবের নামগন্ধ নেই। আগাগোড়া ধবধব করছে বেশ, পায়ে কেবল সেই মুক্তো-বসানো মখ্‌মলের জুতো জোড়াটি।

সভাস্থলে সবাই জরিজরা কিংখাবের রংচঙে পোষাক প'রে, হীরেমোতি যে যতখানি পারে, ধনরত্ন গলায় ঝুলিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছেন—মনে মনে ভাবখানা ছিল, দেখা যাবে দ্বারকানাথের ছেলে কী সাজে আসেন। সভাস্থল গমগম করছে—এমন সময়ে কর্তাদাদামশয়ের সেখানে প্রবেশ। সভাস্থল নিস্তব্ধ—কর্তাদাদামশায় বসলেন একটা কৌচে, পা দুখানি একটু বের করে দিয়ে। কারও মুখে কথাটি নেই।

শ'বাজারের রাজা ছিলেন কর্তাদাদামশায়ের বন্ধু, তাঁর মনেও একটু যে ভয় ছিলনা তা নয়। তিনি তখন সভার ছেলেছোকরাদের পায়ের দিকে ইশারা করে বললেন—"দেখ্ তোরা, দেখ্, একবার চেয়ে দেখ্ এদিকে, একেই বলে বড় লোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি—ইনি তা পায়ে রেখেছেন।"

"ঘরোয়া"

ব্যক্তির মত সমাজেরও বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার ধাত আছে

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ শুদ্ধ সকল লোকেই জানে শ্লেষ্মা বাড়িলেই নিদ্রা বাড়ে, আলস্য বাড়ে এবং গা মাটি মাটি করে, পিত্ত বাড়িলেই গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ছট্‌ফটানি বাড়ে—চেষ্টা বাড়ে; বায়ু বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাড়ে —কল্পনা বাড়ে।

এখন কথা হ'চ্চে এই যে শরীরের যেমন তিনটি প্রধান উপকরণ—বায়ু, পিত্ত, কফ্, সমাজেও তেমনি বায়ু পিত্ত কফ্ আছে কি?—সৃষ্টির দল, গতির দল, এবং স্থিতির দল। স্থিতির দল সমাজের শ্লেষ্মা; —শ্লেষ্মা বলো, জল বলো, রস বলো, মেদ বলো, সবই বলিতে পার, কেবল ভাবটা এই মনে রাখলেই হইল; ভাবটা আর কিছু না—নরম, ঠাণ্ডা, স্থূল, এবং ভার ভার।

গতির দল সমাজের পিত্ত; পিত্তই বলো আর অগ্নিই বলো—একই কথা; ভাব আর কিছু না—গরম, উদ্ধত এবং চঞ্চল।

সৃষ্টির দল সমাজের বায়ু; সৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে ঐশ্বরিক সৃষ্টি নহে, কিন্তু মানসিক সৃষ্টি—ভাবের প্রবর্তনা; যেমন কাব্যরচনা একতরো সৃষ্টি, শিল্পীর অন্তরের ভাব হইতে উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকে; বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নূতন নূতন মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত তৃতীয় একতরো সৃষ্টি।

উপরে যাহা বলা হইল—বায়ু সৃষ্টিশীল বা প্রবর্তনাশীল এবং সত্ত্বগুণ

প্রধান; পিত্ত গতিশীল এবং রজোগুণ প্রধান; শ্লেষ্মা স্থিতিশীল এবং তমোগুণ প্রধান।

সমাজের দলত্রয় কি?—সৃষ্টির দল, গতির দল, স্থিতির দল। সৃষ্টির দলই সমাজের বায়ু। এই দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে চিন্তা এবং কল্পনার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। উদ্ভ্রান্ত কবিত্বের অসম্বন্ধ প্রলাপ; বিজ্ঞান মহলে আনুমানিক সিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি। সমাজের পিত্ত কি? গতির দল; এই দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে গাত্রদাহ, ছটফটানির প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথম উপসর্গ উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বিষদৃষ্টি, রাষ্ট্রবিপ্লব, দলাদলি, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ—প্রবলের আধিপত্য। সমাজের শ্লেষ্মার দল স্থিতির দল; এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে আলস্য অকর্মণ্যতা এবং বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক শ্লেষ্মা বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ বিলাসী রাজসভা এবং তাহার বাহ্য চাকচিক্য, দ্বিতীয় উপসর্গ জোঁকের ন্যায় শোষক অমাত্যবর্গ এবং তাহাদের স্ফীত ভাব, তৃতীয় উপসর্গ নিরন্ন প্রজাবর্গ এবং তাহাদের অত্যধিক সহিষ্ণুতা।

ফরাসীস্ রাষ্ট্রবিপ্লব ত্রিদোষের প্রকোপাবস্থার একটি জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। ফরাসীস্ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত যাহারা অবগত আছেন তাঁহাদিগকে বলিলেই বুঝিতে পারিবেন—Rossou, Voltaire প্রভৃতি বায়ু প্রধান মহাত্মারাই বিপ্লবের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন; আর Robbespere, Danton প্রভৃতি মহাত্মারা বিপ্লবের নির্বাহকর্তা।

কিয়ৎকাল পরেই সমস্ত ইয়ুরোপ—একদিকে পিত্তের প্রকোপ—নেপোলিয়নের তোপাগ্নি; আর এক দিকে ইউরোপীয় রাজন্য সম্প্রদায়ের নাকের জল ও চোখের জল—শ্লেষ্মার প্রকোপ—এবং মাঝখানে বায়ুর প্রকোপ—বিরোধী পক্ষদ্বয়ের বিরোধানল ইংলণ্ড ফুঁ দিয়া উবকিয়া তুলিয়া আড়ালে সরিয়া দাড়ানো এবং সুবিধামত অগ্রসর হইয়া উপর-চাল চালা। "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা"

জগতের কর্তা ঈশ্বর

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

ভগবান দুই কথায় হাসেন ; কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে,— "মা, ভয় কি ? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব।" তখন একবার হাসেন ; এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, 'আমি বাঁচাব'। কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা, একথা ভুলে গেছে। তারপর, যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, "এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার" তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন ; এই মনে করে হাসেন, আমার জগৎব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বল্‌ছে—এ জায়গা, "আমার" আর "তোমার"।

মানুষ অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবান এক, তবে ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এত বাদ বিসম্বাদ দেখা যায় কেন ?" উত্তরে ঠাকুর বল্‌লেন,—যেমন এই পৃথিবীতে—"এটা আমার জমি ও আমার বাড়ী" বলে ঘিরে বসে থাকে, কিন্তু উপরে সেই এক অনন্ত আকাশ, সেখানে কেউ ঘিরতে পারে না, তেমনি মানুষ অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বৃথা গোলমাল করে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাদ থাকে না।

বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা

লাবণ্যপ্রভা বসু

বিদ্যাশিক্ষার একটি মহতী উপকারিতা আছে। তাহা কিরূপ জানিতে চাও, তবে আপনাকে এই প্রশ্ন কর—আমি এতকাল যে

ইতিহাস, কাব্য, বিজ্ঞান বা উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করিলাম, তাহাতে কি পূর্বাপেক্ষা অনেক জ্ঞানী, অধিকতর উৎকৃষ্ট, অধিকতর সুখী হইয়াছি?

জ্ঞানী—অর্থাৎ পশুবৃত্তির শৃঙ্খল ভেদ করিয়া আত্মসংযম শিখিয়াছি কি না? বিরক্তির কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত ভাব ও দুর্ভাগ্য বহনে সাহস লাভ করিয়াছি কিনা?

উৎকৃষ্ট—অধিকতর ক্ষমাশীল, পরের ছিদ্রান্বেষণে অধিকতর বিমুখ, অপরের সুখান্বেষণে অধিকতর ব্যগ্র হইয়াছি কিনা?

সুখী—জীবনের বর্তমান অবস্থায় বিধাতার বিধানে বিরক্ত না হইয়া স্থিরভাবে চারিদিক হইতে সুখ সংগ্রহে তৎপর ও স্বীয় অবস্থায় শোভা সম্পাদনে যত্নশীল হইয়াছি কিনা? ঈশ্বরে অধিকতর বিশ্বাস রাখিয়া জীবনের সুখ দুঃখে তাঁহারই হস্ত দেখিতে শিখিয়াছি কি না?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে, যদি, 'না' বলিতে হয়, তবে অবিলম্বে হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ কর—তথায় দেখিবে তিনটি পশু ঈশ্বরের অঙ্কুরগুলি নষ্ট করিতেছে—অহঙ্কার, দুরাকাঙ্ক্ষা ও আত্মম্ভরিতা।

বিবেকের ভয়

লাবণ্যপ্রভা বসু

একবার একটি শিশু জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—মা আমরা যে সব কথা মনে মনে চিন্তা করি, তাহারা কোথায় যায়? জননী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "ঈশ্বরের কাছে"। মাতার উত্তরে শিশু মাতৃবক্ষে মুখ লুকাইয়া ভীত-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল—"মা, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

উভয়ের ঘরে আগুন লাগিয়াছে

শরৎকুমার রায়

যে 'রাম' হিন্দুর নিজস্ব, যে 'রহিম' মুসলমানের নিজস্ব—সেই রামকে, সেই রহিমকে কবীর অস্বীকার করিয়া সকলকে সত্য জ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সত্য দেবতা সত্যের মধ্যেই বিহার করেন, তাহার আবির্ভাবেই মিথ্যা পলায়ন করিয়া থাকে। কবীর হিন্দুর 'হিন্দুয়ানী' মুসলমানের 'মুসলমানী' দেখিয়া মনের খেদে বলিয়াছেন—হিন্দু বলেন আমার 'রাম', মুসলমান বলেন আমার 'রহিম', পরস্পর মারামারি করেন; অথচ মর্মকথা কেহই বুঝিলেন না। তাঁহাদের জ্ঞান স্থূল, কারণ তাঁহারা পরমাত্মাকে ছাড়িয়া পাষাণকে পূজা করেন। কেহ বা পিত্তল মূর্তি পূজা করেন। কেহ তীর্থব্রতে ভ্রান্ত রহিয়াছেন; কেহ মালা ধারণ করেন, কেহ টুপী পরেন, কেহ তিলক ধারণ করেন, দোঁহা জপ করেন, ভজন গাহিয়া থাকেন, কিন্তু পরমাত্মাকে জানেন না। ঐ যে মিথ্যা অভিমানে মত্ত হইয়া ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়া ফিরিতেছেন, ঐ গুরু শিষ্যের সহিত রসাতলে যাইতেছেন। পীর ফকিরও বহুত দেখিয়াছি, কেহ বা ধর্মগ্রন্থ, কেহ বা কোরাণ পড়েন, গুপ্ত বার্তা বলেন, অথচ ঈশ্বর জানেন না। হিন্দুর দয়া মুসলমানের করুণা, উভয়ই ঘর হইতে পলাইয়াছে। একজন বলি দেয়, অন্যজন জবাই করে—উভয়ের ঘরেই আগুন লাগিয়াছে।

চিন্তা ও কাজ

হেমচন্দ্র সরকার

শুধু মজা, আমোদ, তামাসা লইয়া থাকা ভাল নয়। যে তাহার উপরে উঠিতে পারে না, সর্বদা কেবল হাসি আর তামাসা চায় ও

তাহা লইয়া থাকে, তাহার চরিত্র লঘু হইয়া যায়। সে গভীরভাবে, গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না। আমরা মনে করি, যাহা হইয়া গেল, তাহা হইয়া গেল; যে কথাটি বলিয়া ফেলিলাম, যে চিন্তাটি হৃদয়ে উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্তের সঙ্গেই তাহার শেষ। কিন্তু তাহা নহে, যে চিন্তাটি হৃদয়ে স্থান দিলাম, তাহা হয় আমাকে বড় করিয়া গেল, না হয়, ছোট করিয়া গেল। যে কাজটি করিলাম, তাহা হয় আমার শক্তিকে বাড়াইয়া দিয়া গেল, না হয় কমাইয়া দিয়া গেল।

প্রথম কবিতা

সার্থক জন্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে।

গতিহীন জীবনের শূন্যতা

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;

যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণ গুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে;
যে জাতি চলেনা কভু, তারি পথ প'রে
তন্ত্র—মন্ত্র—সংহিতায় চরণ না সরে!

কর্মেই মুক্তি

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন-মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার' পরে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান, থাক ফলের ডালি,
ছিড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্ম যোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝড়ে।

গরীব মেরে ভরাই না পেট, ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধি মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—
গরীব মেরে ভরাই না পেট
ধনীর কাছে হইনে হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে—
ঐ যে তোমার চোখ রাঙানো
খোকা বাবুর ঘুম ভাঙানো
ভয় না পেলে, ভয় দেখাবে কা'কে?

সিধে ভাষায় বলি কথা
স্বচ্ছ তাহার সরলতা
ডিপ্লমেসির নাইকো অসুবিধে
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণ বাড়ী
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ।
চিরকালের হাতকড়ি যে
ধূলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধি রাজের ছাপ।

দূরের আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান
বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান;
ভুলেও মাটির পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্র সূর্য তারকারে করে ভাই ভাই;
বোঁটা যবে কাটা গেল বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য তার কেহ নয়, সবি তার মাটি।

মাতৃ নিন্দা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেঁচো কয়—নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ করে বলে, চুপ চুপ!
তুমি যে মাটির কীট, খাও তার রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ?

মোটা কেঁদো বাঘ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালাল বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।
ঢেকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়াল সেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে "চাই গ্লিসেরিন সোপ"।
পুঁটো বলে, ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানিনে তা নিজে।
ইংরেজি টিংরেজি কিছু
শিখিনি তো, জাতে আমি নিচু।
বাঘ বলে, "কথা বল ঝুঁটো
নেই কি আমার চোখ দুটো।
গায়ে কিসে দাগ হ'ল লোপ
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ।"
পুঁটু বলে, "আমি কালো কুষ্টি,
কখনো মাখিনি ও জিনিষটি।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই মেম সাহেবের মাসি।"
বাঘ বলে, "নেই তোর লজ্জা।
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।"
পুঁটু বলে, "ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।

জান না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য।
আমার মাংস যদি খাও
জাত যাবে জান নাকি তাও।
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ।"
"ছুঁসনে ছুঁসনে বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘনা পাড়ায় বদনাম
রটে যাবে, ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা,
দেবী বাঘ চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে!"

অকর্মার জীবন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দিন যে যায় না কি করি!
ঘরের হাওয়া যেন বদ্ধ হোয়ে হাঁপিয়ে মরি!
তাস খেলার প্রবল তোড়ে ছিলমের পর ছিলম পোড়ে,
পঞ্জার উপর পঞ্জা উঠে, ছক্কার উপর ছক্কা ধরি;
তবু দিন যায় না কি করি!
দাবা খেলি হই কাৎ, বাজির উপর বাজি মাৎ;
পাশা খে'লে মাজায় বাত, চিৎ হয়ে নভেল পড়ি;—
তবু দিন যায় না কি করি!
পরনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি;
কাটে যদি দিবা, তাহে কাটে নাক বিভাবরী;—
আমার দিন যে যায় না কি করি!
গাঁজা, গুলি, চরস, ভাঙ, খেতে হয় সুতরাং
কিম্বা ব্রাণ্ডী, হুইস্কি, বিয়ার কিম্বা তারী ধান্যেশ্বরী;—
নইলে দিন যে যায়-না কি করি!

কল্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা ;—
আর জীবনটাকে এত ছোট, যে দুদিন যেতেই বল হরি !
আমার দিন যে যায় না কি করি !

অবিশ্বাসীর ভ্রম

সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক

কাবা মস্‌জিদ ঘিরিয়া ঘিরিয়া অন্ধ তিমির দোলে ;
মেলিয়া চরণ মস্‌জিদ পানে, সৌম্যকান্তি মুদ্রিত নয়নে,
শুয়েছিল সাধু ইষ্ট ধেয়ানে, হেনকালে রূঢ় বোলে—
মাতোয়ালী আসি গর্জিয়া কয়, "এ কেমন সাধু ? নাহি কিরে ভয় ?
খোদার আসন যেথা রয়, পা দিলে সেথা কি বলে ?"
হাসি সাধু কয়—"ক্ষম মহাশয় ! না জেনে করেছি যা'
খোদা যেথা নাই, বলে দাও ভাই, কোথায় রাখিব পা ।"

শোকের বিভেদ

রজনীকান্ত সেন

আগুন লাগিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী ;
সর্বস্ব পুড়িয়া যায়, দেখি তাড়াতাড়ি—
প্রবেশিল বিদ্যানিধি নিজ পাঠাগারে,
যত্নের পাণিনি খানি ছিল একধারে—
বাঁচাইল ব্যাকরণ ; গেল আর সব ।
হেন কালে শুনা গেল হায় হায় রব ;
বিপ্র বলে পুড়ে গেল বেদান্তের টীকা,
ব্রাহ্মণী কাঁদিছে গেল হাঁড়ি আর শিকা !

কর্ম ও জন্মের বিচার

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

নীচ কুলে জন্মিলে কি হয়,
পঙ্কজের ত জন্ম পাঁকে !
রূপে গুণে ফুলের শ্রেষ্ঠ,
দেবে তুষ্ট পেলে তাকে।
জন্ম হোক যথা তথা
কর্ম ভাল লয়ে কথা,
রবি বই মুখ খোলে কোথা,
কবি বই কার কথায় থাকে।

নবীন বঙ্গ

কালিদাস রায়

রচিল ধর্ম—প্রয়াগতীর্থ, তব ভগবান পরমহংস,
বেদের বার্তা আনিল ফিরায়ে তব রায়-সেন-ঠাকুর বংশ।
বিদ্যা-করুণা-তেজের সাগর, ভরিল অঙ্ক দানের রত্নে,
বঙ্কিম তব শুভ সংসার, রচিল আমার প্রাণের যত্নে।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায়, তুমি মা আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ভূদেব, রমেশ, দীনবন্ধুর অর্ঘে, পদারবিন্দে দীপ্তি,
তোমার নবীন, হেম, মধু, করে, সুধাদানে চির ক্ষুধার তৃপ্তি,
গিরীশ, দ্বিজেন, বাধিল সমাজ নবীনাদর্শে নটের দৃশ্যে,
ঋষি ব্রজেন্দ্র, তত্ত্বজ্ঞানের ঘৃতের দীপ তুলি ধরিল বিশ্বে।

লুটি মাগো তব চরণ ধূলায়, তুমি মা আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

তব দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
স্বর্ণ, তারক, মহশীন মনি, বলির ধর্মে হয়েছে নিস্ব।
মাভৈঃ মন্ত্রে গুরু সুরেন্দ্র বাজাল বিশ্ব নিনাদী শঙ্খ,
তব আশুতোষ, মৈত্র, ত্রিবেদী, শোভে অলি-সম কমল অঙ্ক।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায়, তুমি মা আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

তব মহেন্দ্র, গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার জলে বাঁচিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়ন—হোমানলে করে হবির বৃষ্টি,
ধরে গুরুদাস ধূপের পাত্র, অবনীর করে প্রাচীন ছত্র,
যোগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে লিখিল তোমার বিজয় পত্র।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায়, তুমি মা আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

সত্ত্বরজের মিলনমন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুর কূলে গাহিল আবার সামের ছন্দ,
পুত্র তোমার আর্তের লাগি বরিছে শীর্ষে অশনি-বর্ষ,
দেশের কর্মে সেবার ধর্ম জনমে যাদের ত্যাগের হর্ষ।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায়, তুমি মা আমার জননী বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত কলায়, শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

জীবন যুদ্ধে শিশুর সরলতা নষ্ট

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

সুকোমল অঙ্কে নিয়া
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি পীযুষ ধারায়
মমতায় বিমোহিয়া
স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া
হে জননী, কর পুনঃ বালক আমায়;
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো, বিষয়ের রণে
তুমি গড়েছিলে যাহা
আর আমি নই তাহা
তব প্রেম—স্বর্গ কথা কিছু নাই মনে :

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে
মহামানবের গাহরে জয়।
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।
এক পৃথিবীর স্তন্যে পালিত
এক রবি শশী মোদের সাথী।

এই হৃদয়ের বড় কোনো মন্দির—"কাবা"—নাই

কাজী নজরুল ইস্‌লাম্।

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
সেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? পার্সী? জৈন, ইহুদী, সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা, বলে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে, পিঠে, কাঁধে, মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ,—পুরাণ,—বেদ—বেদান্ত—বাইবেল—ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা—গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সব,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফুটে তাজা ফুল;
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?

হাসিছেন তিনি অমৃত—হিয়ায় নিভৃত অন্তরালে।
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এই খানে এসে লুটাইয়া পরে সকল রাজ মুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়াএ, জেরুজালেমএ, মদিনা, কাবা—ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এই খানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই বনভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহাগীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুণি
ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এই খানে বসি গাহিলেন তিনি কোরাণের সামগান
মিথ্যা শুনিনি ভাই—
এই হৃদয়ের বড় কোনো মন্দির—কাবা—নাই।

আমার দেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর, ধূলায় আসন?

কেন্ গো তোর মলিন বেশ ?—
সপ্তকোটি সন্তান যার,
ডাকে উচ্চে আমার দেশ।

(কোরস্)

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ ;
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন আমার দেশ।

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার ;
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ
ভক্তি প্রণত চরণে যার ;
অশোক যাহার কীর্তি ছাইল
গান্ধার হ'তে জলধি শেষ ;
তুই ত না মাগো তাদের জননী
তুই ত না মাগো তাদের দেশ

(কোরস্)

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য ইত্যাদি

একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয় ;

একদা যাহার অর্ণবপোত
ভ্রমিল ভারত-সাগর-ময় ;
সন্তান যার তিব্বত চীন,
জাপানে গঠিল উপনিবেশ—
তার কিনা এই ধূলায় আসন
তার কিনা এই ছিন্ন বেশ !
(কোরস্)
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য ইত্যাদি ।

উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে
নিমাই কণ্ঠে মধুর তান ;
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি ;
চণ্ডীদাস গাহিল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য ;
—তুই ত না সেই ধন্য দেশ ।
ধন্য আমরা যদি এ শিরায়
থাকে তাহার রক্ত লেশ ।
(কোরস্)
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য ইত্যাদি

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর

কেটে যাবে মেঘ—নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহিত মেষ !
দেবী আমার, সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ ।

(কোরস)

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য ইত্যাদি

বঙ্গ ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

(১)

মোদের গরব, মোদের আশা—আ মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা ।
কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনলে দেশে ভক্তি ধারা,
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি নাশা ।

(২)

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
ঐ ভাষাতেই মধুর রসে, বাঁধল সুখে মধুর বাসা ।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনল মালা জগৎ জিনে,
তোমার চরণতীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া আসা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌লাম মায়ে 'মা মা' বলে ;
ঐ ভাষাতেই বলব হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

নমি আমি প্রতি জনে আদ্বিজ চণ্ডাল

অক্ষয়কুমার বড়াল

নমি আমি প্রতিজনে—আদ্বিজ চণ্ডাল
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্র প্রকাশ !
নমি কৃষি তন্তু জীবী, স্থপতি তক্ষণ,
কর্ম-চর্মকার,
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচর
বহ অদ্রি ভার ?
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়,
একত্রে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে—
আত্মার আত্মীয়।

প্রাচী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগ যুগব্যাপী অমারজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী ।

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্দ্রে হল অবসান,
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে ?
নব প্রভাতের পরশমাণিকে
সোনা করি দিবে ভুবন খানিকে
তারি লাগি বসি' আছি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী ।

জরার জড়িমা—আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে

নবরূপ তব উঠুক না ফুটে,
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক আঁধার
নব যুগ আসি ডাকে বার বার—
দুঃখ আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

ভৈরব রাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ,
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।